শৈলজার কথা



শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা

মেদিনীপুর
মাধবী প্রেস
হইতে
শ্রীনলিনী নাথ দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

ভূমিকা।

কবিবর নবীনচন্দ্রের **রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস** বাংলা সাহিত্যের অতুল সম্পদ। এই কাব্যত্রয়ের কেন্দ্রস্থলে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারই কীর্ত্তিগাথার কীর্ত্তন জন্য এই কাব্যত্রয় নিয়োজিত। 'খণ্ড-ভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতা এবং অলৌকিক কৌশল, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক মহাভারত স্থাপন করেন'—তাহাই এই কাব্যত্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি দেখাইয়াছেন যে তাঁহার জীবনের মহাব্রত :—

"এক ধর্ম্ম এক জাতি,
একই সাম্রাজ্য-নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,
'একমেবাদ্বিতীয়ং'—করিব নিশ্চিত
এই ধর্ম্মরাজ্য, **মহাভারত** স্থাপিত।"

এবং কবি ভগবানের অবতার গ্রহণের সার্থকতা এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

"সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত দুর্জ্জন,
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এই পাপভার
করিতে মোচন,—করিতে প্রচার
মহারাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য—করিতে প্রচার
ভারতে **মহাভারত**, কৃষ্ণ অবতার।

রৈবতকের মুখবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি, যে কবিবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজগৃহে অবস্থান কালে কাব্য-জগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল 'মহাভারত' গ্রন্থ আর একবার পাঠ করেন। তাহার ফলে নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই মহান জীবনব্রত প্রথম প্রতিভাত হয়। তখন তিনি ভগবানের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তিনখানি মহাকাব্যের (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) সূচনা করেন এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যে এই তিনখানি কাব্যের আখ্যান-বস্তুর (Plot) খসড়া প্রস্তুত করিয়া রৈবতক লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই খসড়া ও রৈবতকের প্রথম কয়েক সর্গের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্রকে পত্র লিখেন :—

"You have planned a new Mahabharat indeed—an exceedingly ambitious work * * * * If executed adequately, many will pro-

bably consider it as Mahabharat of the 19th Century."

অর্থাৎ, 'তুমি সত্যসত্যই এক অভিনব মহাভারতের সূচনা করিয়াছ—অতি দুঃসাহসের কার্য্য। * * * * * যদি রচনা সুচারু হয়, তবে অনেকে হয়ত ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিবে'।

এই অনেকের মধ্যে আমি একজন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি 'সাহিত্য' নামক প্রখ্যাত মাসিকপত্রে এই রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং কেন এই সকল কাব্য বর্ত্তমান যুগে মহাভারতের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখনও নবীনচন্দ্রের **প্রভাস** প্রকাশিত হয় নাই। কবিবরের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি প্রভাসেরও বিস্তৃত সমালোচনা করি। কিন্তু নানা কারণে সে সৌভাগ্য আমার ঘটিয়া উঠে নাই। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় এই **নবীনকাব্য কথা** লিখিয়া আজ আমার সে ত্রুটি ক্ষালন করিলেন। সেজন্য ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।

মহেন্দ্রবাবু সুলেখক, সহৃদয় ব্যক্তি। কাব্যরস আস্বাদন করিতে এবং করাইতে তাঁহার যোগ্যতা আছে। তাঁহার রচনা সরল অথচ সরস এবং ভাবপূর্ণ। তাঁহার প্রবন্ধাদি অনেকে সযত্নে পাঠ করেন। সেজন্য আমার মনে হয় যে

নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের ভিত্তির উপর রচিত তাঁহার এই **শৈলজার কথা** পড়িয়া অনেক বঙ্গীয় পাঠকের ঐ মূল কাব্যত্রয়ের রসাস্বাদনের জন্য লালসা জাগ্রত হইবে। কারণ, মহেন্দ্র বাবু 'গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজা' করিয়াছেন—নবীনচন্দ্রের কাব্য হইতে পংক্তি সমূহ উদ্ধৃত করিয়া শৈলজার চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে মূল কাব্যত্রয়ের বেশ একটী সুসংহত, ও সুগ্রথিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শৈলজা কে? শৈলজা কবির অপূর্ব্ব মানসসৃষ্টি। মূল মহাভারত বা পুরাণাদিতে এই চরিত্রের কোন ইঙ্গিত নাই।

সকলেই জানেন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসখা—পার্থ-সারথি। অর্জ্জুন পূর্ব্বকল্পের নর এবং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।

"অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ং।"

অর্জ্জুনের বাহুবল, ব্যাসের জ্ঞানবল এবং সুভদ্রার প্রেমবলকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবনব্রত উদযাপন করেন। অতএব এই কাব্যত্রয়ে আমরা সর্ব্বদাই এই তিন চরিত্রের সংস্পর্শে আসি।

কিন্তু শৈলজা কে? তাহার চরিত্রের সার্থকতা কি? তাহার কথা লইয়া গ্রন্থকার এই নাতিদীর্ঘ **শৈলজার কথা** লিখিলেন কেন? ইহার সম্পূর্ণ উত্তর পাইতে হইলে পাঠককে **শৈলজার কথা** আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে

হয়, পত্নীদের স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা কিরূপে মাতৃত্বের স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর আকার ধারণ করে এবং পরিণামে সেই নির্ঝরিণী কিরূপে ভগবদ্ভক্তির অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, এই **শৈলজার কথা** পাঠ করিয়া পাঠক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন—

"তোমার কৃপায় আজি, পতি মম নারায়ণ !
সেই প্রেম-গঙ্গা পদে জন্মিল তোমার,
পাইয়াছে নারায়ণ, প্রেম-পারাবার !
পেয়েছ দুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
লহ দুহিতায় বুকে, গাও কৃষ্ণনাম।"

এবং **শৈলজার কথা** শেষ করিয়া কবির ভাষায় বলিবেন—

"মধ্য মূর্ত্তি জগন্নাথ, শৈলজা, সুভদ্রা পার্শ্বে,
বিরাজিবে কালবক্ষে এ তিন মূরতি।
মধ্যে হরি-হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-স্রোতস্বতী
বহিবে অলকানন্দা, মাতা ভাগীরথী।"

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

নিবেদন

শৈলজা জাতীয়-কবি নবীনচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শৈলজা-চরিত্রের সম্যক বিশ্লেষণ করিতে হইলে যে মহাকাব্যত্রয়ের সহিত এই চরিত্রের উপাখ্যান-ভাগ সংশ্লিষ্ট, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কবিবর নবীনচন্দ্রের এই তিন খানি মহাকাব্য—**রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস,** ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, মধ্যলীলা ও অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। যাঁহারা এই তিন খানি মহাকাব্যের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা অবশ্য নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেব খণ্ডভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতা এবং অলৌকিক কৌশল, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এক বিশাল মহাভারত প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অবগত আছেন। কিন্তু যাঁহারা এই মহাকাব্যত্রয়ের আখ্যান-বস্তুর সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাকীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত আভাষ এই স্থলে প্রদান করিলাম।

সুদূর অতীত কাল। শ্বেতকায় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণকে নৃশংস অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়া—কানন কান্তারে বিতাড়িত করিয়া—ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। নিগৃহীত কৃষ্ণকায় নাগ ও দস্যুগণ হিংস্র

জন্তুর ন্যায় আর্য্যগণের সেই প্রবল অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদানে তৎপর! চারিদিকে বহুদেববাদ ও নিষ্ঠুর বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার! ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেবলমাত্র ভেদ-নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। অন্য দিকে বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষের নৃপতিমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে! এই বিবাদ-বিসম্বাদের অবসর লাভ করিয়া ক্ষাত্রশক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে! স্বপ্রাধান্যলোপের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ-শক্তি অনার্য্য-শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশের ষড়যন্ত্রে সমুদ্যত! এমন সময় এক মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই মহাপুরুষই **শ্রীকৃষ্ণ**। তিনি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা করে লইয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিপক্ষে মস্তক উত্তোলন করিলেন। এক ভবিষ্য আশার মধুর আলেখ্য আর্য্য-অনার্য্যের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডভারতে **মহাভারত** প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি প্রচার করিলেন—

"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি, সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
"একমেবাদ্বিতীয়ং" করিব নিশ্চিত;
ওই ধর্ম্মরাজ্য **মহাভারত** স্থাপিত।

শ্রীকৃষ্ণের মহাকীর্ত্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নরনারায়ণের মহাকীর্ত্তি, এই **মহাভারত** সংস্থাপনে

শৈলজা কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কবি তাঁহার মহাকাব্যত্রয়ে শৈলজা-চরিত্রের যেরূপ ক্রমবিকাশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশ দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছি। তবে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে গিয়া কোথাও একটু আধটু সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবিরই ভাষায় ও ভাবে তাঁহার চিত্রিত শৈলজার আলেখ্য সুবিন্যস্তভাবে পাঠকবৃন্দের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। এই আলেখ্য প্রতিষ্ঠায় যদি কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে—তাহা আমার, চিত্রকরের নহে, ইহা মনে রাখিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে **শৈলজার কথা** মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত **মাধবী** পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। কতিপয় সাহিত্যিক বন্ধুর উৎসাহে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, আমার পরম হিতৈষী, শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, মহোদয় স্নেহপরবশ হইয়া এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। অভাজনের অকিঞ্চিৎকর এই সাহিত্য-প্রয়াস যে তাঁহার ন্যায় মনস্বীর অমূল্য স্নেহ-

সম্বলিত হইল, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার সুগভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের নিকট আমি অনেক বিষয়েই ঋণী ; সুতরাং তাহার কাছে আর নূতন করিয়া কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

পুস্তকখানির অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি-মানসে তিনখানি ছবি দিয়াছি। ছবিগুলি কলিকাতার উদীয়মান চিত্র-শিল্পী, স্নেহাস্পদ শ্রীমান অজিতকুমার সেন কর্ত্তৃক অঙ্কিত। শিল্পীর নিপুণ তুলিকাস্পর্শে কবির কল্পনা কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দ তাহার বিচার করিবেন।

কালিকা-কুটীর
পাটনা বাজার, মেদিনীপুর।
মহালয়া, ১৩৩৪।

বিনয়াবনত—
শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস



বাংলার কুললক্ষ্মীগণের

পবিত্র করকমলে

কবি নবীনচন্দ্রের নিপুণ তুলিকা-চিত্রিত

আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মূর্ত্তি শৈলজার পুণ্য চরিত-কথা

ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে

অর্পণ করিয়া

নবযুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা-সমাকুল

উৎকণ্ঠিত চিত্তে

অদূর ভবিষ্যের পথপানে

চাহিয়া রহিলাম।

রচয়িতা।

প্রথম অধ্যায়

সোনজা–দেশভক্ত

শৈলজা নাগবালা—নাগবংশীয় চন্দ্রচূড় রাজার কন্যা। "নাগ" অর্থে কেউটে বা ঢোঁড়া সাপ নহে; নাগ জাতি অনার্য্য জাতি বিশেষ। চন্দ্রচূড় রাজা খাণ্ডবপ্রস্থে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণ তথায় একছত্র আধিপত্য করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের এই আধিপত্য অধিকদিন বিস্তার লাভ করে নাই। শ্বেতকায় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া নৃশংস অত্যাচারে উৎপীড়িত করতঃ তাঁহাদিগকে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। এই পাতাল সম্বন্ধেও সাধারণের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে। পাতাল ভূগর্ভে নহে; ভারতের পুরাতন মানচিত্রে উহা সিন্ধুনদতীরে সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এখনও ভারতবর্ষের নাগপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে নাগজাতির রাজ্যের চিহ্ন আছে; এবং এখনও নাগজাতি ভারতের পার্ব্বত্যাঞ্চলে বাস করে। পুরাণোক্ত বাসুকির নাম অনেকে অবগত আছেন; সেই বাসুকি শৈলজার পিতৃব্যসুত। কবি এই বাসুকিকে নাগরাজ নামে অভিহিত করিয়াছেন; এবং প্রথম অবস্থায় তাহাকে ঘোর কৃষ্ণদ্বেষী, ক্রোধী ও দাম্ভিকস্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। চন্দ্রচূড় রাজা কিন্তু পরম কৃষ্ণভক্ত; সুতরাং বাসুকির সহিত তাঁহার মতের মিল হইল না। "মতভেদে মনোভেদ"। চন্দ্রচূড় রাজা কিশোর বয়সে অসি মাত্র সম্বল করিয়া পাতাল পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধে অবশ্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই তখন ছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু হইলে কি হয়?

"——————যেই প্রেম পারাবার
হৃদয়েতে, হ'ল অসি ভিক্ষা-যষ্টি সার।

বেড়াইলা বনে বনে, অচলে অচলে,
ভারতের নানা স্থানে।"

* * * * *

শিখিলেন ছদ্মবেশে ঋষিদের কাছে
আর্য্যবিদ্যা, আর্য্যধর্ম্ম। নির্ম্মাইয়া শেষে
এই বিন্ধ্যাচল শিরে "সুনীরার" তীরে
সুন্দর কুটীর ক্ষুদ্র—"পুলিন কুটীর"
হইলা আশ্রমবাসী।"

এই আশ্রমে শৈলজার জন্ম হয়। শৈলজা নাম হইল কেন, কবি স্বয়ং শৈলজার মুখেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'—————— সেই কুটীরেতে,
সেই শৈলে জন্ম—নাম **শৈলজা** আমার।'

অষ্টমবৎসর অবধি শৈলজা এই আশ্রমে, জনক জননীর স্নেহে ও মমতায় লালিত পালিত হয়। শৈলজার এই আট বৎসরের ক্ষুদ্র ইতিহাস শ্রবণ করুন—

অষ্টম বৎসর যবে, পড়ে মনে, প্রভু!
স্থলে স্থলচর সহ করিতাম ক্রীড়া,
জলে জলচর সহ দিতাম সাঁতার,
সুনীরার তরঙ্গেতে ডুবিয়া ভাসিয়া।
কভু ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে পর্ব্বত শিখরে,
করিতাম কৃষি, সুখে জনকের সহ;
কভু থাকি জননীর ছায়ায় ছায়ায়,
করিতাম গৃহকার্য্য। জনক জননী

কি আদরে হাসিতেন, চুম্বিতেন মুখ।
কি আদরে নাচিত এ অভাগীর বুক!
কার্য্য-অবসরে পিতা কতই আদরে
শিখাতেন আর্য্যভাষা, অস্ত্র সঞ্চালন—
লক্ষ্য ফুল ফল পত্র। কহিতেন—পাপ,
অকারণ জীবহত্যা—জীব মনস্তাপ।

ক্ষুদ্র জীবনের কি ক্ষুদ্র সরল ইতিহাস! এই আট বৎসরের মধ্যে বালিকার সকল প্রকার শিক্ষাই যেন সমাপ্ত হইয়াছিল। অথবা অষ্টমবৎসর গত হইলেই যাহার জনকজননীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভের বাসনা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে তাহার পক্ষে এই আট বৎসরের মধ্যে যতটুকু শিক্ষা লাভ সম্ভব তাহা লাভ না করিলে চলিবে কেন? ফলতঃ আমরা বালিকার চরিত্রের উত্তরাংশে দেখিতে পাই যে তাহার বাল্যের এই শিক্ষাই তাহাকে উত্তর জীবনে ক্রমশঃ পূর্ণ উন্নতির পথে প্রধাবিত করিয়াছিল।

অষ্টম বৎসর পরে বালিকা একদিন সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইল। চন্দ্রচূড় রাজা দুগ্ধ অন্বেষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে খাণ্ডব দর্শনে গমন করিতেন। অনার্য্যের অতীতগৌরবশ্মশান, পুণ্যতীর্থ খাণ্ডবপ্রস্থ তাঁহার বড় আদরের স্থান ছিল। চন্দ্রচূড় রাজা প্রথমতঃ ইন্দ্রপ্রস্থবাসী আর্য্য ব্রাহ্মণগণের নিকট কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনার্য্যদ্বেষী আর্য্যগণ সেই সামান্য দুগ্ধভিক্ষা দানেও যখন অসম্মত হইলেন, তখন চন্দ্রচূড় বলপূর্ব্বক তাঁহাদের গাভী হরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ সে যুগে ভেদনীতির প্রশ্রয় দানে সিদ্ধকাম ছিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সমীপে যাইয়া এই

অত্যাচারের প্রতীকার ভিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন তাহাদিগকে নগরপালের কাছে প্রতীকার লাভের আশায় আশ্বস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু চক্রী ব্রাহ্মণগণ অর্জ্জুনের সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন "দস্যুরাজকে রণে পরাস্ত করিয়া গাভী-গণের উদ্ধার সাধন নগরপালের সাধ্য নহে।" অর্জ্জুন তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়া তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। নাগরাজ চন্দ্রচূড় রণক্ষেত্রে প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে চমৎকৃত করিলেন বটে, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকট তাঁহার প্রভাব কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?

রণকুশল অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইল না—বীর কৃষ্ণভক্ত নাগরাজের প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে অনন্তে বিলীন হইল।

———"নীরবিল নাগ পতি"

কিন্তু "বিশাল ত্রিশূল

অর্জ্জুন হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ

কাঁপিয়া উঠিল অঙ্গ থর থর থর।"

অর্জ্জুন স্বহস্তে নাগরাজের মৃতদেহ দাহন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিলেন বটে; কিন্তু তীব্র অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয়ের সকল শান্তি বিনষ্ট হইল। তিনি বালিকার অনুসন্ধানে গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

"————————আসিলাম গৃহ ছাড়ি; কিন্তু

অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা

ভাসিতে লাগিল সদা নয়নে আমার।

বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান

কি যে তীব্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার

বসাইল বিষদন্ত ; সুখশান্তি মম
হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্য্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।
অষ্টম বৎসর আজি দেশদেশান্তরে
বেড়াইনু ; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান,
অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।"

অর্জ্জুন শৈলজার সন্ধানে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ দেশে দেশে ঘুরিয়া অবশেষে রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একদিন ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেবের শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিলেন। কথায় কথায় ব্যাসদেব অর্জ্জুনের তীর্থভ্রমণের কারণ জানিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন যথাযথ প্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকার উদাসীনব্রতসাধনে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "কৃষ্ণ! অর্জ্জুন সেই বালিকার সন্ধানে ফিরিতেছে বটে ; কিন্তু এই সন্ধানের পরিণাম শুভ কি অশুভ তাহা জান কি ?" বলিলেন—

"নহে অসম্ভব
বিষম অশুভ তার সেই দরশনে;
শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা।
যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে
ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে,
হয় ত তেমনি বালা ক্রমে শুকাইয়া
জীবনের বৃন্ত হ'তে পড়িবে ঝরিয়া।
নহে অসম্ভব কৃষ্ণ! পার্থ হুতাশন
প্রবেশিয়া অনাথার জীবন-উদ্যানে

পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম
দুঃখিনীর। পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জ্জুন
হন্তা সেই অনাথার!”

মহর্ষির বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হিম-শীতল হইয়া গেল। তিনি স্থির অপলকনেত্রে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ব্যাসদেব নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহর্ষির চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক রৈবতকে ফিরিয়া আসিলেন।

আমরা শৈলজার মূল উপাখ্যানভাগ হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। উক্ত কিয়দংশ সম্প্রতি পাঠকগণের অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে; কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত শৈলজার মিলন ও আত্মপরিচয় প্রদান কালীন এই অংশটির বিশেষ যোগাযোগ আছে বলিয়াই প্রারম্ভে আমরা ইহা তাঁহাদের জ্ঞাপন করিয়া রাখিলাম।

এদিকে শৈলজার পিতা চন্দ্রচূড় রাজার মৃত্যু-সংবাদ অচিরে পাতালে নাগপুরে আসিয়া পৌছিল। শৈলজার জননীর কর্ণে তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রবেশলাভ করিল। অনার্য্য পতিব্রতা রমণী

-শোক সমাচার
শুনিলা যেমনি, চাহি মুহূর্ত্ত আকাশ
পড়িল ভূতলে, ছিন্ন এ জীবনপাশ!
বিধির অপূর্ব্ব-বীণা—দেবতা বিভব—
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার, হইল নীরব।”

অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও শৈলজার তখন জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে মুহূর্ত্তে তাহার জনকজননীর বিয়োগ-ব্যথা নিদারুণ শেলাঘাত করিল। বালিকা সেই দারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় নাগরাজ বাসুকি (শৈলজার পিতৃব্যসুত) তাহাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া গেল এবং যথাযথ শুশ্রূষা করিয়া তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিল। শৈলজা তদবধি বাসুকি আলয়ে দিন যাপন করিতে থাকে।

নাগরাজ বাসুকি চিরদিনই অর্জ্জুনকে শত্রু ভাবিয়া ঘৃণা করিত। ঘৃণার ও শত্রুতার কারণ শ্রীকৃষ্ণসোদরা সুভদ্রা। নাগরাজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে—

"——————চক্রী নারায়ণ
পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ
যাদব-কৌরব-শক্তি করিবে মিলিত,
তা' হ'লে অনার্য্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।"

এদিকে নাগরাজ আযৌবন সুভদ্রার করপ্রার্থী; কিন্তু অর্জ্জুন থাকিতে তাহার আশা কিছুতেই মিটিতে পাবে না; সুতরাং অর্জ্জুনকে ক্ষেত্র হইতে ছলে কৌশলে সরাইয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। নাগরাজ বুঝিত যে অর্জ্জুনের সহিত বলে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কেননা অর্জ্জুনকে

"——সম্মুখ সমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।"

তাই এতদিন ধরিয়া সে কোনও প্রকার সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

আজ আর নাগরাজের আনন্দের সীমা নাই। আজ তাই যখন সে শুনিল, যে তাহার চিরদিনের পরম শত্রু অর্জ্জুন রৈবতকে আসিয়াছে, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। ক্ষুদ্রা সরলা বালিকা শৈলজাকে সে প্রতিহিংসার অস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বীজ বপন করিয়া তাহাকে এক অসীমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে শৈলজাকে কহিল—

"——— পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে ; সম্মুখ সমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্ব গ্রহণ,
কাল-ভূজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমায় সুযোগ মত দিবি সমাচার ;
হরিব সুভদ্রা—চির বাসনা আমার।"

শৈলজা শুনিল—পিতৃব্যসুতের আদেশ কিরূপ হেয় ও কঠোর, তাহাও বুঝিল ; কিন্তু তথাপি সে আদেশ অমান্য করিবার শক্তি তখন তাহার নাই। পিতৃব্যসুতের সেই কঠোর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সে ধীরপদে অর্জ্জুনের অনুসন্ধানে রৈবতকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থলে শৈলজার চরিত্র যেন একটুখানি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটা দিক দিয়া দেখিলে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়। অনার্য্য-সুতা শৈলজা মানবী মাত্র, দেবী নহে। কবি তাহাকে মানবীপদ হইতে কার্য্যগুণে, স্বভাবগুণে ক্রমে দেবীপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তা' ছাড়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদানের অক্ষমতাও বড় গৌরবের বিষয় নহে ; সুতরাং মানবী

শৈলজা নাগরাজের আদেশ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহার মানবীত্ব বরং এ ক্ষেত্রে আরও উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘটনাস্রোতে তাহার এই ঈর্ষা-বিষপূরিত হিংসা-তমসাচ্ছন্ন হৃদয় রৈবতকে আসিয়া কি সুন্দর, অপার্থিব, শান্তিকরুণামাখা, সুকোমল, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল, আমরা ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদান করিব।

একদিন রৈবতকের প্রান্তঃসীমায় এক বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীরবর অর্জ্জুন পর্ব্বতোপরি পুরোদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা এক ভীষণ উরগ তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধফনা হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেল! বীরের হৃদয় মুহূর্ত্ত মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল! তিনি দিক লক্ষ্য করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কিশোরবর্ষীয় এক কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, ধনুর্ব্বাণধারী সুন্দর বালক শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান। তিনি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"——দেখিতে বালক তুমি,
কিন্তু যে কৌশলে বিন্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়;
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?
আসিয়াছ কেন হেথা? আসিলে কেমনে?
দিয়াছ জীবন মম, কি দিব তোমায়?"

বালক অর্জ্জুনের পদতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে উত্তর করিল—

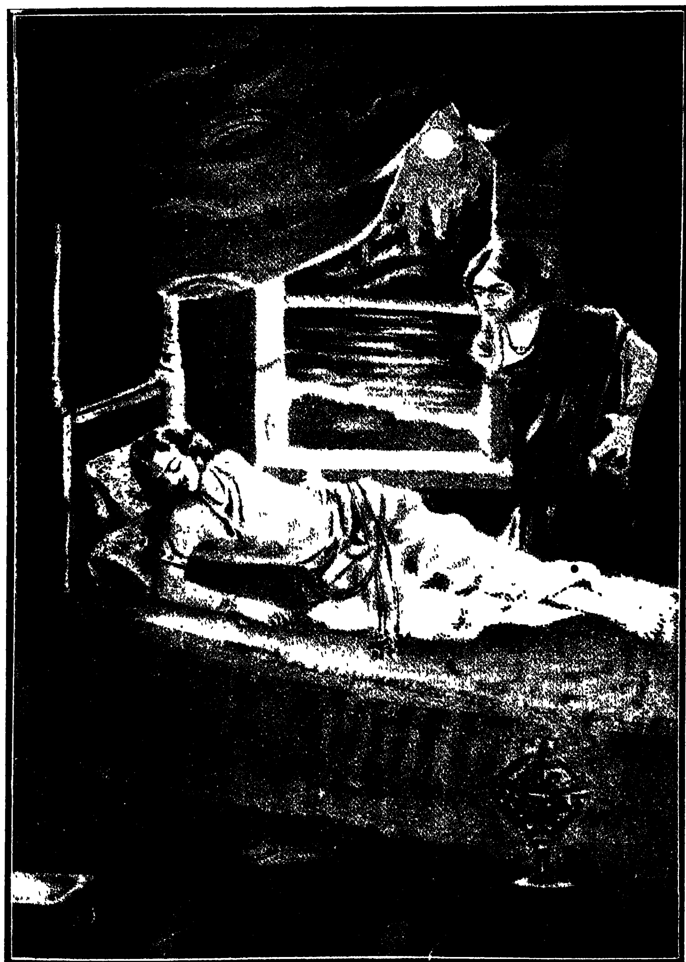
"——বীরচূড়ামণি!
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি'
আসিয়াছে এই দাস, **শৈল** নাম তার;
সেবিবে চরণাম্বুজ; ভিক্ষা চাহে আর।"

পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের সহিত ছদ্মবেশী শৈলজার এই প্রথম পরিচয়। অর্জ্জুন বালককে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। শৈলজা ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের নিকট আত্মগোপন করিতেছে, উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

আর একদিন রাসোৎসবে রৈবতক মুখরিত। জনস্রোতে অধিত্যকা, উপত্যকা প্রপূরিত। শত শত রঙ্গভূমি, শত শত নাট্যশালা, প্রস্ফুটিত কুসুমদামে, হরিত পল্লবে, পুষ্পকেতনে সজ্জিত হইয়া দীপালোকে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! ফুল্ল চন্দ্রালোকে রৈবতক গিরি স্থির-বিজলী-মাখা মেঘমালার মত শোভা পাইতেছে। রাসোৎসবে সকলেই মত্ত—আনন্দে দিশেহারা—সকলেই আত্ম-বিস্মৃত! কেবল একটি প্রাণী এমন উৎসবের দিনেও চঞ্চল হয় নাই। সে ভৃত্য **শৈল**। বিষাদমূর্ত্তি শৈল অর্জ্জুনের আবাসকক্ষ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া অনিমিষনেত্রে পূর্ণচন্দ্রের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।

"————উৎসব-ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাহি তাহে
একটিও ক্ষুদ্র রেখা সুখ-চন্দ্রিকার।
একদণ্ড, দুইদণ্ড, ক্রমে দণ্ড চারি
বহিল শর্ব্বরী-স্রোতে; দরিদ্র বালক
সেই ভাবে, সেইখানে, আছে দাঁড়াইয়া!"

ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর হইল। উৎসবের কোলাহল ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল। অর্জ্জুন উৎসবান্তে স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। সুভদ্রার রূপমাধুরী অর্জ্জুনকে সে রাত্রিতে মোহিত করিয়াছিল। তিনি প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গের ভূষণ ও সজ্জা খুলিতে-



বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শৈলজা

ছিলেন এবং স্বগতঃ অস্ফুট স্বরে সুভদ্রার রূপগুণের প্রশংসা করিতে-ছিলেন। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সুপ্ত বিশ্বচরাচর সে প্রণয়-উচ্ছ্বাস শ্রবণ না করিলেও নিদ্রাহীন শৈলের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল। শৈল অধোমুখে মুক্ত কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস শ্রবণ করিল—

"যতই শুনিতেছিল, ততই তাহার
নবজলধরনিভ বদনমণ্ডলে,
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হ'তেছিল ধীরে ধীরে মৃদুল সঞ্চার;
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে!"

তার পর ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈলজা প্রভুর ভূষণ, বাস খুলিতে লাগিল। অর্জ্জুন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"——শৈল! এত ক্ষণ,
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি নানা স্থানে?"

শৈল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"দেখিনি উৎসব প্রভু।"

অর্জ্জুন। "——তবে কি কারণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত শৈল! এত ক্ষণ?"

শৈল। "——প্রভু প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস।"

কি সুন্দর ও সরল উত্তর! অথচ, কি কঠিন আত্মপ্রতারণা! হৃদয়ের মধ্যে যখন তুমুল সংশয়ের আন্দোলন চলিতেছে—যখন একদিকে গুরুতর কর্ত্তব্য প্রতি পদে কঠোর হইতে কঠোরতর আদেশ বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং অন্য দিকে যাঁহার প্রতি ক্রমশঃ হৃদয়ের অনুরাগ অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে, সেই প্রভু বা

প্রেমাস্পদ বাঞ্ছিতের অথচ পিতৃহন্তার সস্নেহ বচন কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে—তখন, হৃদয়ের সেই সংক্ষুব্ধ অবস্থায়, আত্মগোপন করিয়া সেই বাঞ্ছিতের সহিত বাক্যালাপ কি কঠিন—কি দুরূহ!

অর্জ্জুন আদরে শৈলজার ক্ষুদ্র মুখখানি বাম করে তুলিয়া, দক্ষিণ করে তাহার ক্ষুদ্র কপোলবাহী কুন্তলরাজি সরাইয়া দিয়া, অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন?

————"পার্থ অতৃপ্ত নয়নে
দেখিলা সে মুখে, সেই বিস্তৃত নয়নে,
সেই ঘন ভ্রূরেখায়, ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাতশিশিরসিক্ত অপরাজিতার,
করুণামণ্ডিত সেই বর্ণ নীলিমার!
কি মহত্ত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কিবা কোমলতা—
কিবা নিরাশ্রয়ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!"

অর্জ্জুন বলিলেন—

"শৈল, এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন্ মতে আমি?"

শৈল প্রভুর পা দুখানি দুই করে ধারণ করিয়া ঢল ঢল নেত্রে প্রভুর পানে চাহিয়া উত্তর করিল—

"————বীর শ্রেষ্ঠ! দিবানিশি দাস
পাইতেছে যে পবিত্র পদ পরশন
অনার্য্যের পরমার্থ; ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্য্য কুমার।"

কি সরল সুসঙ্গত উত্তর! এমন সুন্দর উত্তর অনার্য্যা রমণী ত দূরের কথা, আর্য্যা রমণীর মধ্যেও এ হেন অবস্থায় বিরল বলিলেও

অত্যুক্তি হয়না। কেন না, পিতৃহন্তা বলিয়া নিশ্চিত ধারণা থাকা সত্বেও কে এমন মহত্ত্বব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করিতে পারে? এই এক উত্তরের মধ্যে দিয়া আমরা শৈলজার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারি।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পার্থ স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে শয়ন করিলেন। শৈল ধীরে ধীরে সুকোমল করে তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তাহার কোমল করস্পর্শে মনে করিলেন যেন—

"দুইটী কুসুম ফুল্ল, কোমল, শীতল,
আলিঙ্গিয়া পদমূল, চুম্বিয়া, চুম্বিয়া,
করিতেছে যেন অঙ্গে অমৃত বর্ষণ!"

এতখানি ভাবিলেন—এমন করিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখ দেখিলেন, তবু অর্জ্জুন তাহাকে বালিকা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না!

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় যাম হইল। অর্জ্জুন শৈলকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন; কিন্তু কি-জানি-কেন, শৈল তথাপি তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। তাহার নিদ্রালস তনু, শিথিল অঙ্গ, প্রভুর চরণাম্বুজে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি তাহার পদসেবার বিরাম নাই! শান্তমুখে শৈল শূন্য পানে চাহিয়া আছে। তাহার সুকোমল করপল্লবে অর্জ্জুনের পদাম্বুজ সংস্থাপিত।

আর"———ঢল ঢল দুটী নেত্র,
অধরে প্রসন্ন হাসি, কি অঙ্গ মহিমা!
নীল-মণি-নিরমিত ভক্তির প্রতিমা!
কি আনন্দ! যেন বহু তপস্যার পর
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর!"

শৈলের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব ভাবকে কি বলিয়া অভিহিত করিব? ইহা পূর্ব্বরাগের লক্ষণ, না বাঞ্ছিতের প্রতি প্রেমিকার আত্মনিবেদন?

যদি বাস্তবিক ইহা অলক্ষ্যে আত্মনিবেদন হয়, তাহা হইলে শৈলের আত্মগোপনের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্ম-নিবেদন-ভাবের প্রকাশ কত সুকঠিন, তাহা রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয় যাম অতীত হইল। পার্থ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শৈলজা একবার বাতায়ন পথে আকাশের পানে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া অদূরে এক বনান্তরালে প্রবেশ করিল। সেখানে একজন আগন্তুক ছায়ার আঁধারে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আগন্তুককে প্রণাম করিল। আগন্তুক তাহার ক্ষুদ্র ললাট চুম্বন করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দুইজনে অদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

আগন্তুক। "বহুক্ষণ বসিয়াছি তব প্রতীক্ষায় ;
বল শৈল! করেছ কি উদ্দেশ্য সাধন ?"

শৈল। "করিয়াছি।"

আগন্তুক। "বুঝিয়াছ পাণ্ডবের মন ?"

শৈল। "বুঝিয়াছি।"

আগন্তুক। "প্রেমাকাঙ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রার ?"

শৈল। "প্রেমাকাঙ্ক্ষী।"

আগন্তুক। "——ভদ্রা কি তেমন অনুরাগিণী
তাহার ?"

শৈল। "নবাগত ক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র আমি,
অন্তঃপুরনিবাসিনী সুভদ্রা সুন্দরী ;
কেমনে বুঝিব আমি হৃদয় তাহার ?
কিন্তু ভ্রাতঃ! ঐ দেখ পূর্ণ শশধর
বসি সিন্ধুবক্ষোপরে, দেখ কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ! প্রস্তর যেমন
নিরুচ্ছাস, নীরনিধি আছে কি এমন ?"

আগন্তুক ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তার পর শৈলজাকে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। শৈলজা তৎক্ষণাৎ আগন্তুকের পদতলে পড়িয়া ক্ষুদ্র সুকোমল করে তাহার পদযুগল ধারণ করিল এবং করুণ নয়নে তাহার ভীম দৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া কাতর স্বরে কহিল—

"হেন পাপ অভিসন্ধি কর পরিহার ;
নহে নিরমম তুমি। অভাগ্য অনার্য্য
হয়েছে কঙ্কালসার ; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগণন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কাল রাশি ? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব,পুড়িবে আপনি ?"

কিন্তু শৈলজার কাতর উক্তিতে পাষাণহৃদয় আগন্তুকের যেন মন গলিল না। সে শৈলজাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নানা প্রকার ভৎর্সনা করিল ও নক্ষত্রের মত বেগে কোথায় লুকাইয়া গেল!

এই নবাগত পাষাণহৃদয় আগন্তুক যে নাগরাজ বাসুকি, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

নাগরাজের কঠোর তিরস্কার ও লাঞ্ছনা শৈলজার অন্তরে দারুণ আঘাত করিলেও শৈল আপনার কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হইল না। সে ইতঃপূর্ব্বে আপনার কর্ত্তব্য-পথ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে জানিতে পারিয়াছিল, যে তাহার ভ্রাতার সেই ঘৃণিত আদেশ কখনই তাহার জীবনের ব্রত হইতে পারে না। যাহাকে দেখিলেই হিংসার আগুণ নিবিয়া যায়, তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা এবং সুযোগ পাইলে তাহাকে কালভূজঙ্গিনীর মত দংশন

করা যে তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন, ইহা শৈলজার বুঝিতে বাকী রহিল না। শৈলজা পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া, অস্তগামী শশধরের পানে চাহিয়া, একে একে জীবনের বিগত ঘটনাবলীর আলোচনা করিতে লাগিল। অশ্রুস্রোতে শৈলজার বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। শৈলজা অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিল ঃ—

"————কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিবে আপনি ভাই! ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি, হইবে নিষ্ফল
তোমার জীবন ব্রত, আমার জীবন।"

শৈলজার এই অভিসন্ধি কেন শুনিবেন?

"কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপ মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
আসিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে, যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ—বীরত্বের প্রতিকৃতি,
দয়ার আধার—নিবিল সে হিংসানল!
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে! বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত মন্দাকিনী! হোক সব স্বপ্ন—
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন,
এ জগতে স্বপ্ন, শান্তি—দুঃখ, জাগরণ!"

নিরাশার অন্ধকারে যখন দুর্ব্বল, অশান্ত, মানবহৃদয় হাবুডুবু খাইতে থাকে, তখন জগতে বাস্তবিকই একমাত্র স্বপ্নের মাঝেই তাহার শান্তি লাভের সম্ভাবনা। শৈল এতদিন রৈবতকে থাকিয়া

ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের সেবকরূপে দিন যাপন করিয়া, অর্জ্জুনকে বেশ চিনিয়া লইয়াছিল। ভ্রাতার দুরভিসন্ধিবশে পরিচালিত হইয়া সে ইহাও বেশ বুঝিয়াছিল, যে অর্জ্জুন স্থভদ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ; স্থতরাং অর্জ্জুনের প্রতি তাহার যে অনুরাগ ও প্রেম দিন দিন সঞ্চিত হইতেছে, ইহা হৃদয়ে উঠিয়া দুইদিন পরে হৃদয়েই মিলাইয়া যাইবে ! বাস্তব জীবনে তাহাদের এ প্রেম কখনও সফল হইবার অবসর আসিবে না। শৈলজা তাই স্থির করিয়াছিল, যে এমন প্রেমাস্পদ বাঞ্ছিতকে বাস্তবজীবনে লাভ করিতে না পারিলেও অলীক কল্পনায় তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখ লাভ করার চেয়ে জগতে আর কি শান্তি থাকিতে পারে ? শৈলজা তাই সেই বাঞ্ছিতের মদিরাময় প্রেমের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া সেই কুহকমাখা স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিল ! প্রকৃত প্রস্তাবে অনার্য্যা রমণী আর্য্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইলে তাহার পক্ষে এই স্বপ্ন ভিন্ন অন্য শান্তিই বা কোথায় ?

শৈল কাতরভাবে পূর্ব্ব গগনের পানে চাহিয়া ভাবিল—

"অনাথ নাথ ! আশা অন্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে। যাপিব জীবন
নিরাশার উষালোকে দেখিয়া স্বপন।"

তার পর ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল। ক্ষুদ্রা সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে তখন চিন্তার যে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে ?

অর্জ্জুনের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শৈল বিনীত ভাবে প্রকারান্তরে সেই দুরভিসন্ধির বিষয় অর্জ্জুনকে জানাইল। বালিকা তখনও আত্মপরিচয় প্রদান করিল না ; কেবল মাত্র অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল

যে অর্জ্জুন যাহা শুনিবেন, তাহা যেন ঘুণাক্ষরে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করেন। অর্জ্জুন সেই নৃশংস ষড়যন্ত্রের বিষয় শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে শৈলের প্রতি এক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন! কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

"দেখিলা সে মুখ শান্ত, শান্ত ভ্রূ'নয়ন,
সরল ও সুশীতল উষার মতন
বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণে।"

অর্জ্জুন ক্ষণকাল সেই মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তার পর মৃগয়ায় চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুনের রৈবতকবাস শেষ হইয়া আসিল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া হস্তিনায় ফিরিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এক দিবস অর্জ্জুন শৈলকে কহিলেন—

"———শৈল! মম রৈবতক বাস
হইয়াছে শেষ; তুমি ছাড়িয়া আমায়
যাইবে কি গৃহে তব?"

কি নির্ম্মম প্রশ্ন! প্রশ্ন শুনিয়া শৈলজার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! দরদর অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া গেল! শৈল কাঁদিতে লাগিল।

সত্যই তো কাঁদিবার কথা। সংসারে যে সকল বন্ধনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কেবল একটি মাত্র বন্ধনে আপনাকে এতদিন আবদ্ধ রাখিয়াছে—যে বন্ধন তাহার জ্ঞানের প্রথম উন্মেষেই সংসারের শ্রেষ্ঠ মধুর বন্ধন এবং তাহার ক্ষুদ্র জীবনের চরম বন্ধন বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—সেই চিরাকাঙ্খিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আজ সে কোথায় যাইবে?

শৈল উত্তর করিল—

"———নাহি গৃহ এ দাসীর।"

অন্তরের আবেগে—হৃদয়ের ব্যাকুলতায়—পরাণের রুদ্ধ মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল—

"———নাহি গৃহ এ দাসীর।"

অর্জ্জুন শুনিলেন—শুনিয়া একবার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বালকের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন—

"———শৈল! তবে চল হস্তিনায়
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্র নির্ব্বিশেষে
পালিবে তোমায় পার্থ। তব স্বার্থহীন
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহা সুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্লভ বৎস!"

শৈল কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। ঝটিতি সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার কক্ষে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই যে অশ্রু—এ অশ্রু কিসের? অনাবিল প্রেমের—না বুক-ফাটা ব্যাকুলতার?

পার্থ বিষণ্ন অন্তঃকরণে কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর শৈলের কক্ষে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু এ কি! শৈলের সে ভৃত্য-বেশ কোথায়? তৎপরিবর্ত্তে তিনি এ কি দেখিতেছেন!

"অপূর্ব্ব যোগিনী মূর্ত্তি, মাধুরী-মণ্ডিত,
অপরাজিতার সৃষ্টি, সদ্য সুবাসিত।
শীতল মাধুর্য্যে, অঙ্গ, মধুর রেখায়
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধারায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল,—

প্রশান্ত-করুণার স্বর্গ, দর্পণ-যুগল।
ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর-কোণায়,
শান্তি-করুণার স্বপ্ন-সমাধি তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতনু শরীর,
শান্তি-করুণার যেন পবিত্র মন্দির!
দেখ মুখ—দেখিবে সে হৃদয় তাহার
কি শান্তি-করুণা-মাখা প্রেম-পারাবার!
নীরব—কি যেন এক করুণা-উচ্ছ্বাস
অন্তরে অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিঃশ্বাস!
যোগিনীর পরিধান আরক্ত বসন,
একটী কুসুম হার অঙ্গের ভূষণ।"

অর্জ্জুন বিস্ময়ে বিহ্বল! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈল! শৈল!—দেবী কি মায়াবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"

শৈল অর্জ্জুনের চরণ যুগল ধারণ করিয়া কাতর স্বরে উত্তর করিল—

"————ছলনা দাসীর
ক্ষমা কর বীরমণি! ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে
সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে। কহিব দাসীর
আত্ম-পরিচয়, কিন্তু সেই শোক-গীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"

আত্মবিস্মৃতের মত অর্জ্জুন সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা তখন একে একে সুখপূর্ণ শোকপূর্ণ জীবনের কাহিনী ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। আমরা এই সমূহ কাহিনী পূর্ব্বেই পাঠকের গোচর করিয়াছি। অর্জ্জুন সেই শোকপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া উন্মাদের মত শৈলজাকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রুপ্লাবিত বদনে বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"শৈলজে ! শৈলজে ! তুমি সে অনাথা বালা !
চন্দ্রচূড় কন্যা তুমি !———— * * * *
আমি তব পিতৃহন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন ? নাহি স্বর্গ, কে বলে ধরায় ?
এ যে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায় !
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল ! আমি। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ———"

অর্জ্জুন কি বলিতে যাইতেছেন বুঝিতে পারিয়া শৈলজা সবেগে অর্জ্জুনের মুখে হাত দিয়া তাঁহার সেই উচ্ছ্বাস নিবারণ করিল। তারপর উভয়ে বহুক্ষণ নীরব। অবিরল অশ্রুধারায় উভয়ের বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত ভীষণ অনুতাপ করিলেন। শৈল তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। অনুতপ্ত, মর্ম্মাহত অর্জ্জুন তখন বালিকার দুইটি কর ধরিয়া কাতর ভাবে কহিলেন :—

"শৈলজে ! শৈলজে !
* * * * করেছি প্রতিজ্ঞা
জনক-শশ্মানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি। অনুতাপে মম—

তব পিতৃহত্যা-পাপ জুড়াইব শৈল !
দেখি সুখ-হাসি তব সুধাংশুবদনে।
চল ইন্দ্রপ্রস্থে শৈল ! অথবা খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে, করিব উদ্ধার
হিংস্র-বন্য-পশু-বাস ; স্থাপিব আবার
পিতৃরাজ্য তব ; পিতৃসিংহাসন
শৈলজে ! তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ,
শোভিবে চন্দ্রিকা-বক্ষ শারদ গগন !”

কিন্তু শৈলজা আর বাহ্য সম্পদের অভিলাষিনী নহে। সে অর্জ্জুনের সমুজ্জ্বল হৃদয়স্বর্গে বিন্দুমাত্র স্থান ভিক্ষা করে। সে কি চায় শুনিবেন ?

“—দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তিরাজ্য নাথ ! হয়েছে স্থাপিত,
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে, অঙ্কে অঙ্কে, করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্বচরাচর
হবে মম পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝর-সলিল,
হইবে অর্জ্জুন মম ; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর !
তুমি শৈলজার এক, অনন্ত, ঈশ্বর !”

শৈলজা এমনি তন্ময়তা, এমনি “অর্জ্জুন”-ময়তা, এমনি বিশ্ব-প্রেমের উপলব্ধি চাহে। দুই দিন বাদে, বিমুক্তা বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে, কাননে কান্তারে, যাহার ঘুরিয়া বেড়াইবার

বাসনা—সে কেন সঙ্কীর্ণ খণ্ডরাজ্যের অধিকারিণী হইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে? ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়াও যে বিশাল বিশ্বপ্রেমের মধুরতা আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা করে—সে কেমন করিয়া সঙ্কীর্ণ প্রেমের গণ্ডীতে আপনাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে? নিরাশাপীড়িত ভগ্নকণ্ঠে শৈলজা উত্তর করিল—

"যেই রক্তবাসে যোগী সাজি প্রাণনাথ!
খুঁজিলে এ অভাগীরে, পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য; পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী; যাও প্রাণনাথ!
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা! রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা-হার—ত্রিদিবভূষণ—
শুকায়ে পড়িবে মালা; মালাদাত্রী, হায়!
হয়তো বাসুকি-অস্ত্রে শুকাবে ধরায়।"

শৈলজা চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বনফুল আপনার অন্তরনিহিত সৌরভে বাঞ্ছিতকে ক্ষণতরে আকুল করিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা কেহ দেখিল না! অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু রৈবতকের ত্রিঃসীমায় তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে অর্জ্জুন ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিলেন—

"———ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিল দুর্ব্বার—
পিতৃহন্তা হলো আজি হন্তা অনাথার।"

রৈবতকে কবি শৈলজাকে এই পর্য্যন্ত চিত্রিত করিয়াছেন। এতক্ষণ আমরা শৈলকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দেখিলাম। কবি তাহাকে যে ভাবে বালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কবিত্বের হিসাবে তাহা এই অবস্থায় প্রযুয্য হইতে পারে। রৈবতকে শৈলজা মানবী মূর্ত্তিতে যে অদ্ভুত নিঃস্বার্থ-ভাব, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই জগতে দুর্লভ! ভক্তবীর নাগরাজ চন্দ্রচুড়ের শিক্ষার গুণে, শৈলজা আট বৎসর কাল মাত্র শিক্ষালাভের অবসর পাইয়া এই দুর্লভ চরিত্রের অধিকারিণী হইয়াছে। কবি অতঃপর তাহাকে এক অসীমধৈর্য্যশালিনী প্রসন্নতাস্বরূপিনী চিরপ্রেমময়ী মহীয়সী নারীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

"কুরুক্ষেত্রে" আমরা এইবার শৈলজার সেই চরিত্রের বিকাশ বুঝিতে প্রয়াস পাইব।



দ্বিতীয় অধ্যায়

মেনকা—কৃষ্ণকেন্দ্রে

শৈলজা রৈবতক ছাড়িয়া গেল।

রৈবতকে আসিবার সময় পাপ-অভিসন্ধি-প্রসূত যে বীভৎস নরক হৃদয়ে বহন করিয়া আনিয়াছিল, রৈবতক-বাস অবসানে তৎপরিবর্ত্তে এক বিশাল বিশ্বপ্রেমের সূচনা-স্বর্গ লইয়া সে চলিয়া গেল!

কিন্তু এই বিশ্বপ্রেমাঙ্কুরের ধারণা করিতে শৈলজা সঙ্গে সঙ্গেই পারিয়া উঠে নাই। রৈবতক ছাড়িয়া মুক্তা বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় সে যখন এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ছায়ার মতন চলিতে লাগিল, তখন তাহার জীবন উদ্দেশ্যবিহীন—যাত্রা অনির্দ্দিষ্ট! সে চলিতেছে বটে, কিন্তু কোন পথে কোথায় যাইতেছে, কিম্বা কেন যাইতেছে, তাহা সে জানে না! সে দেখিল—

"————উপরে আকাশ
শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময়, মরুময়
নিম্নে ধরাতল; হু হু রবে সমীরণ
যাইছে বহিয়া!"

আর এই মহা মরুভূমির মধ্য দিয়া শঙ্কিত, কম্পিত পদে একাকিনী, অনাথিনী সে চলিয়াছে! তাহার মনে হইল—

"আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারিদিকে;
হু হু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে!"

অর্জ্জুনগতপ্রাণা রমণী নিরাশার এই কঠোর দাবদাহকর উত্তাপ বুকে লইয়া কতক্ষণ পথ চলিবে? ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে সে ভূতলে পড়িয়া গেল। নিদ্রা কি মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার চেতনা অপহরণ করিল, সে বুঝিতে পারিল না। বিস্মৃতির এই অঙ্কে, সহসা যেন এক মধুর স্বপ্নের চকিত স্পর্শে সে সচেতন হইয়া উঠিল! তাহার বোধ হইল, যেন সে কোন এক অতীন্দ্রিয়, অবাস্তব রাজ্যে অবস্থিত।

সেখানকার জগত যেন নিয়ত শ্যামশোভাময় ও আনন্দময়! বিচিত্র-বর্ণের কুসুমরাজি সৌরভ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। নবোদিত ভাস্কর মৃদু মধুর কিরণ ছড়াইয়া এক অপূর্ব্ব সুষমায় ধরণীকে প্লাবিত করিয়াছে। বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে সুখের গান, মানবের মুখে মুখে প্রীতির বিমল হাসি! শৈলজা দেখিল, পার্থ যেন শিয়রে বসিয়া স্বীয় অঙ্কে তাহার শান্ত মুখখানি স্থাপন করিয়া তাহাকে অমিয় বচনে কি বলিতেছেন। তাঁহার মুখ প্রশান্ত, স্থির, পিতৃস্নেহপূর্ণ—নয়ন যেন স্নেহ-করুণাসিক্ত, পবিত্রতার পুণ্য প্রস্রবণ! শৈলজা শুনিল, অর্জ্জুন যেন তাহাকে বলিতেছেন—

"———তোর, পিতার শ্মশানে
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
দুহিতার মত পালিবরে তোরে
জানেন অন্তরযামী।
অন্তরে অন্তরে পূজিয়া প্রতিমা
পুষেছি তোরে সদায়
দুহিতার মত— এই মহাপাপ
কেমনে করিব হায়!
দেখ পিতৃপ্রেম অনন্ত বিস্তার
কি পবিত্র সুশীতল;
পতিপ্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত
পূরিত কামনানল!"

শৈলজার হৃদয়ের ঈর্ষ্যার নরক নিভিয়া গেল—তাহার অন্তরের সকল সংশয়, দ্বিধা ও অশান্তি দূর হইল—অপূর্ণ কামনা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন নিমেষের মধ্যে পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি লাভ করিল! সে নয়ন মেলিয়া দেখিল—বেলা অবসানপ্রায়। ধরাতল শান্তিপূর্ণ;

মাথার উপরে বিহঙ্গগণ আনন্দ-কাকলি গাহিতেছে—চারিদিকে কুরঙ্গ, শশক, শিখী প্রভৃতি তাহাকে সস্নেহ অন্তরে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাহার অঙ্ক অধিকার করিয়া আনন্দে রোমন্থন করিতেছে। রমণী আশৈশব বনচারিণী। বনে বনে বিচরণ করিয়া সকলের সহিত পূর্ব্ব হইতে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে—আজ তাই বহুকালের পর তাহার মিলন-সুখের আশায় সকলে তাহাকে সাদরে বেষ্টন করিয়া যেন এক শান্তির ত্রিদিব রচনা করিল। শৈলজা সেই বন-স্নেহ, সেই বন-শান্তি লাভ করিয়া—স্নেহময়ী স্বপ্ন-স্মৃতির সেই উদ্বোধন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেন কি নবজীবন লাভ করিল! তাহার মনে হইল, সে যেন আর সে শৈল নহে—স্মৃতির সোনার-কাঠি স্পর্শে সে যেন এক অভিনব সত্তায় রূপান্তরিতা!

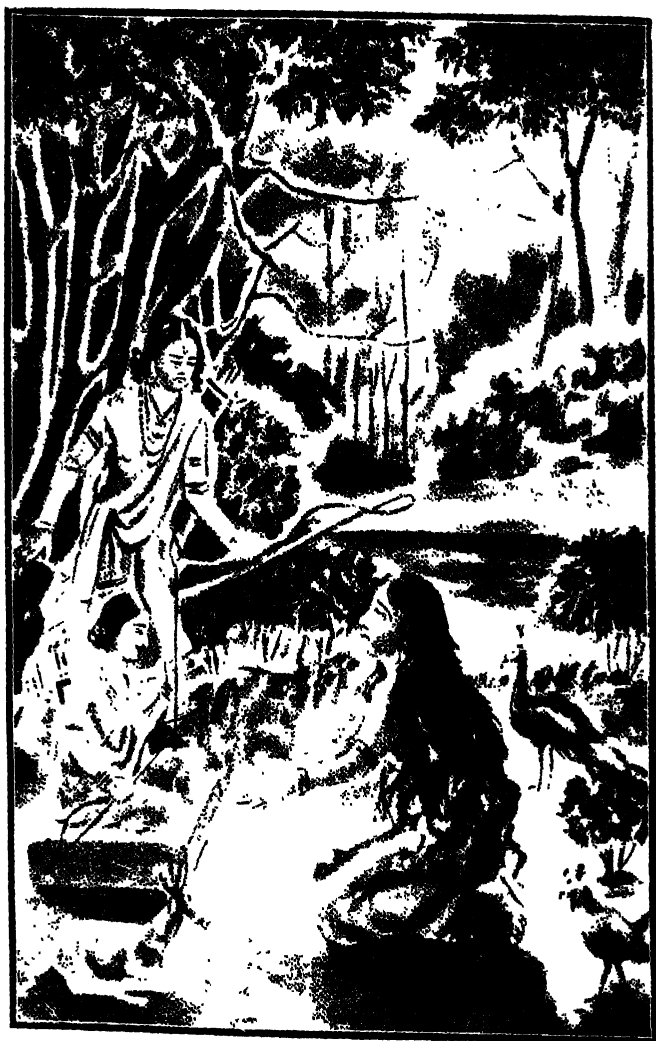
শৈলজা তখন সেই নীরব অরণ্য মধ্যে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। অতীত জীবনের সুখ-দুঃখ-বিজড়িত অনেক চিত্র তাহার মানস-নয়ন সমক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিস্মৃতির অন্ধকারময় যবনিকা সরাইয়া সে তাহার বিগত জীবন-নাট্যের ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আপনার কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার মনে হইল, শৈশবে তাহার জনক তাহার মাতার কাছে কহিতেন—

"————ধর্ম্মে প্রিয়ে! সুখ;
ইন্দ্রিয় সংযম, সেই ধর্ম্মের সোপান।
নাহি চাহি রাজ্যধন। শৈলজা আমার
হইবে ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যের; বিলাইয়া হরিনাম-সুধা
বাঁচাবে অনার্য্য জাতি। ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোন মতে অনার্য্য উদ্ধার।"

জনকের সেই বড় আশার বারতা বালিকাকে যেন আজ কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিল। শৈলজা আকাশপটে আপনার কর্ত্তব্য-রেখা অঙ্কিত দেখিল। আর দেখিল, দূরে—অতি উর্দ্ধে নীলমণিময়পটে, সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করিয়া—তাহার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, স্নেহের ত্রিদিবে যুগল স্নেহ-দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন! মাতাপিতার সেই পুণ্যছবি—সেই সুপ্রসন্ন প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল, যে অনার্য্যের ধর্ম্মের জননী হইয়া—তাহাদিগের মধ্যে হরিনাম-সুধা বিলাইয়া তাহাদিগের উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলে তবেই তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে এবং তাহার জনক-জননী প্রীত হইবেন। শৈলজা তাই ভূমিতে প্রণাম করিয়া সেই যুগল-দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে কহিল—

"————দেব! দেবি! দিয়া পদাশ্রয়
কন্যার কঠিন ব্রত করিও পূরণ।"

কন্যার এই করুণ মিনতি রক্ষা করিতে তাহার যুগল-দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে তাহার শিরে স্নেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেননা, শৈলজা অচিরে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে পল্লব-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এই কঠিন ব্রত সাধনায় ব্রতী হইবার আয়োজন করিতে লাগিল। শৈলজা দেখিল, কঠোর ব্রত সাধনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে মধুমাখা বিশ্বপ্রেমের মধুরতা উপলব্ধি করিতে হইবে; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পার্থের প্রতি তাহার অন্তর-নিহিত প্রেম ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ সীমা পরিহার করিয়া—কামনা ও আসক্তির মাদকতা নাশ করিয়া—বিস্তৃতভাবে এই বিশ্বের সকলের মধ্যে ছড়াইয়া না পড়ে—যতদিন অবধি এই স্বার্থমূলক পতিপ্রেম জীবনের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আপনাকে অনন্তের



মুক্তকেশী উদাসিনী শৈলজা পার্থের মৃন্ময় মূর্তি পূজায় রত।

অভিমুখী করিয়া না তুলে—ততদিন পর্য্যন্ত এই বিশ্বপ্রেমের ধারণা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র এবং তাহার এই কঠিন ব্রতও দুঃসাধ্য রহিবে। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সে তাই সর্ব্বপ্রথম এই কামনা-জড়িত প্রেমের উচ্ছেদ সাধনে তাহার কাম্য-দেবতা পার্থের পূজায় রত হইল। লতাকুসুমশোভিত সেই পল্লব-কুটীর মধ্যে এক সুচারু বেদিকার উপর মৃগয়ার বেশে শোভমান পার্থের স্বহস্তনির্ম্মিত এক মনোরম মৃন্ময়-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সে অপূর্ব্ব ভক্তি ও নিষ্ঠাভরে সেই মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিল।

সাধনার কয়েক বৎসর অতীত হইলে একদিন কৈশোর উল্লাসে পার্থকুমার অভিমন্যু মৃগয়ায় আসিয়া সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন মরুভূমে মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায়, সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এই সুন্দর কুটীরখানি এক অপূর্ব্ব শান্তি-নিকেতনের মত শোভা পাইতেছে! কুটীরের চারিধারে মনোহর কুঞ্জবিতান—নাতিদূরে এক সুন্দর সরোবর—তৎপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা। কুটীর-প্রাঙ্গনে বৃক্ষে বৃক্ষে সারী, শুক প্রভৃতি বিহঙ্গনিচয় পার্থের পুণ্যময় দশনাম গাহিতেছে এবং সমগ্র কানন সেই নামের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত!

মুক্তকেশী, উদাসিনী শৈলজা ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে সেই দশবিধ পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিলে শশক, ময়ুর, মৃগ কুক্কুট প্রভৃতি মধুর সুস্বরে বন প্লাবিত করিয়া দলে দলে তাহার কাছে আসিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে লাগিল। কিশোর বালক প্রখর মধ্যাহ্নে, ক্লান্তদেহে এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আশ্রমের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে তাঁহার দেহ ও মন যেন কি এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল! বিস্ময়ের আবেগে তিনি এই বনবাসিনীর পদাম্বুজে প্রণাম করিয়া

তাহার পরিচয় লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি শৈলজাকে প্রশ্ন করিলেন—

"———————————যাঁহার
এ অপূর্ব্ব, পূজা আমি কুমার তাঁহার ;
কে তুমি মা ? কহ—বড় কুতূহল মনে।
কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে ?"

কুমারের প্রশ্নে শৈলজার মুখে স্নেহহাসি ফুটিল—তাঁহার বক্ষে মধুর স্নেহস্রোত উছলিয়া উঠিল। সে স্নেহস্বরে কহিল—

"———————————বাছারে !
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে ;
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব,
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর ?
পার্থ-উপাসিকা আমি।
কেন পুজি তারে ?
কেন পূজে বৎস ! নর, ওই সবিতারে ?
ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীর্য্য—কে না পূজে বল ?
করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল।
জগতে দেবত্ব ধর্ম্ম ভক্তি-প্রস্রবণ ;
হিমাচলে সিন্ধু গঙ্গা লভেন জনম।
মম ভক্তি-হিমাচল জনক তোমার।
সেই ভক্তিবলে,
পাইনু তোমারে আজি এই বনস্থলে।
এস বৎস ! এস বুকে ! তপস্যা আমার
হইল সফল বুঝি ———————"

শৈলজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—আর কথা সরিল না। স্নেহ-ভরে কুমারকে বুকে টানিয়া লইয়া সে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল। কুমার দেখিল, বননিবাসিনীর হৃদয়ের কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ যেন উৎসারিত হইয়া তাহাকে অবিরল স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিতেছে! শৈলজার নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! কুমার বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু এ অশ্রু কিসের, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, এ অশ্রু অমূল্য মাতৃস্নেহের বিকার মাত্র! কিন্তু হায়! অনার্য্যা-রমণী আর্য্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া গভীর নিরাশাভগ্ন হৃদয়ে তাহার চিরবাঞ্ছিত, চিরদয়িতের কুমারকে বক্ষে চাপিয়া যে আজ সাফল্যের সুখস্বপ্নে বিভোর এবং সে যে আজ উচ্ছ্বসিত প্রেম ও অনাবিল আনন্দের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহা কুমার কেমন করিয়া ধারণা করিবেন? কুমার শৈলজার সেই স্নেহ-স্বর্গে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হাসি-কান্নায় কুমারের সারাদিনমান অতিবাহিত হইল। বিচিত্র কাকলি-কল্লোল সহ সন্ধ্যা-সতী ধীরে ধীরে কাননে আসিয়া দেখা দিলেন। বনপুত্র ও বনপুত্রীগণ কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া উল্লাস-গীতি গাহিতে গাহিতে শৈলজার কাছে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের হাসি ও বাঁশীরবের সহিত গোচারণাগত গাভীবৃন্দের হাম্বারব মিশিয়া সমগ্র কানন মুখরিত করিয়া তুলিল। কুমার দেখিলেন, একটী গাভী 'মা—মা' রবে ডাকিতে ডাকিতে সেই ছায়ালোকসেবিত সন্ধ্যায় শ্বেতকাদম্বিনীর ন্যায় তাঁহার বনমাতার কুটীর-দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। শৈলজা 'মা—মা' রবে স্নেহভরে তাহাকে দোহন করিলে পুণ্যবতী গাভী সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া অজস্র শ্বেতামৃত বর্ষণ করিল! বনবালিকাগণ নাচিয়া নাচিয়া উল্লাসভরে নানাবিধ

ফলমূল লইয়া তাহাদের বনমাতাকে অর্পণ করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ সেই বনবাসিনীর কর, বক্ষ বা অঞ্চল ধরিয়া—কেহ বা গলদেশে বাহু জানু জড়াইয়া গোচারণের কতবিধ সমাচার প্রদান করিল। কুমার দেখিলেন, মাতৃমূর্ত্তি যেন সেই স্নেহের কানন উপশোভিত করিয়া পুষ্পিতা বল্লরীর ন্যায় বিরাজমানা এবং বালকবালিকারা বন-কুসুমের ন্যায় তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিশু-হৃদয়ে সেইদিন সর্ব্বপ্রথম যেন কি এক পবিত্রতার স্বর্গ-দ্বার খুলিয়া গেল! তিনি তন্ময়চিত্তে সেই মাতৃস্নেহ-স্বর্গের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

শৈলজা বালকবালিকাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"————দেখ বাছাগণ!
আসিয়াছে মম রাজপুত্র একজন।"

সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের, কুহকদণ্ডস্পর্শে সে নৃত্য-গীতোল্লাস—সে কোলাহল থামিয়া গেল! সবিস্ময়ে, অচঞ্চলনেত্রে সকলে কুমারের পানে চাহিয়া রহিল এবং তাহার বসন ভূষণ দেখিতে লাগিল! জনৈক বনবালক সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করিল—

————"মাগো! বনপুত্র সনে
খেলিবে কি রাজপুত্র; যাবে গোচারণে?"

বালকের কাতর কণ্ঠস্বরে কুমারের যেন সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মাতা, মাতুলের এক প্রীতিময় শিক্ষা তাহার মনে পড়িল। মনে হইল—

"সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী,
সকলের পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী।
দেখিবে সকল জীবে আপনার মত,
পরহিত প্রাণপণে সাধিবে সতত।"

শৈলজার উত্তর দিতে, না দিতে কুমার মহোল্লাসে তাই তাহাদের সহিত খেলিবেন বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বনপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রদেব নীলাম্বরে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ, বিমল জোৎস্নায় ধরা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। কাননাভ্যন্তরে সেই সুচারু চন্দ্রকরলেখা এক বিচিত্র আলো-ছায়ার রাজ্য গঠন করিতে সুরু করিয়াছে। কুমার সেই ছায়ালোকে তাহাদের সহিত কতবিধ ক্রীড়া করিলেন। বালকবালিকাগণের উচ্চহাসি, আনন্দ-কলরব ও উল্লাস-গীতিতে কানন ভরিয়া গেল! তাহারা কুমারকে পত্রে পুষ্পে তাহাদের বনরাজা সাজাইল; কোন চারুহাসিনী বালিকা তাহার বনরাণী হইল; নিজেরা পারিষদের বেশ গ্রহণ করিল। তার পরে পুষ্প-বেদিকার উপর কুসুমিত, লতাপল্লবরচিত এক পুষ্প-সিংহাসনে, সেই কুসুমকোমলাঙ্গ রাজারাণীকে বসাইয়া রাজ্যাভিনয় দেখিবার জন্য তাহাদের বনমাতাকে ডাকিয়া আনিল। শৈলজা সেই মধুর দৃশ্য দেখিয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে দুইটীকে লইয়া কতই কৌতুক করিল। সাদরে কুমারের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"———বউ ত হয়েছে মনোমত?"

কুমার লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেলেন। কল্পিতা বালিকা-রাণীর অকৃত্রিম অনুরাগ যেন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। কুমারের তখনকার মনের অবস্থা—

"সত্য ভাবিতাম আমি, সে আমার রাণী
সত্য সে ভাবিত মনে, আমি তার স্বামী।"

ভাবের আবেশে কুমার কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া মায়ের-দেওয়া ফল মূল তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। তার পর কুমার বনজননীর বুকে ঘুমাইয়া

পড়িলেন—বনবালকবালিকাগণও সেই অমূল্য স্নেহের ত্রিদিবে তাহাদের বনমাতাকে ঘিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিশি অবসানে বালকবালিকাগণ কানন খুঁজিয়া কত প্রকার খাদ্য আনিয়া তাহাদের সঙ্গীকে প্রদান করিল। বিদায়কালে তাঁহার গলা জড়াইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

"———আবার ভাই, আসিবে কি বনে?
আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে?
সাজাইয়া বনফুলে পল্লবমালায়,
আমাদের রাজা ভাই! করিব তোমায়।"

শৈলজা কাঁদিয়া কহিল—

"——————————বন জননীরে
পড়িবে কি মনে বাছা! আসিবি কি ফিরে?"

বনভ্রাতাভগ্নীগণের সজল নয়ন ও রোদনরতা বনমাতার কাতর মুখখানি দেখিয়া কুমারের হৃদয় গলিয়া গেল! তিনি বনজননীর স্নেহ-বুকে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শৈলজা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করিতে করিতে স্নেহ-শোকোচ্ছ্বাসে কহিল—

"——————————বাছারে!
জনক জননী কাছে বনবাসিনীর
কহিও না কোনকথা এই তাপসীর;
কহিলে তপস্যাব্রত হইবে বিফল।
যথাকালে তাহাদের চরণকমল
দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন;
তদবধি এ তপস্যা রহিবে গোপন।
ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সবিতারে
কি কাজ জানিয়া তাঁর—জানাইয়া তাঁরে?"



কুমার ক্ষণেক পরে বনমাতার পদধূলি লইয়া—ভাইভগিনীগণকে সাদর বচনে তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বালক-বালিকারা কাননের প্রান্তভাগ অবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। পথিমধ্যে তাহারা কত ফল ফুল লইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। হায়! অনার্য্য বালক-বালিকাগণের এ অমূল্য স্নেহের তুলনা জগতে আর কোথায় মিলিতে পারে?

আমরা এই চিত্রে শৈলজার বিকাশোন্মুখ চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারি। বিদায়কালীন পার্থ-উপাসিকার এই যে কাতর অনুরোধ—ক্ষুদ্রা সূর্য্যমুখীর এই যে গোপন আরাধনা, নীরব আত্মদান এবং গভীর অকপট প্রেম—ইহারই মধ্যে আমরা শৈলজার কঠোর আত্মসংযম ও ত্যাগমাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। সর্ব্বোপরি বীরকুমার অভিমন্যুর প্রতি তাহার যে আন্তরিক অনুরাগের চিত্র দেখিয়া আসিলাম, তাহা হইতে তাহার এই নিষ্কাম উপাসনার মূলে যে ইন্দ্রিয়জয়ের কি কঠিন প্রয়াস লুক্কায়িত আছে তাহারও একটা ধারণা করিতে পারি। রৈবতকে যখন সে ভৃত্যবেশে দিনযাপন করিয়া তাহার হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতাকে সুভদ্রার করপ্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন হইতেই এই অনার্য্যা রমণী বিলক্ষণ জানিত যে তাহার অন্তরনিহিত প্রেম অন্তরে রহিয়াই বিলীন হইয়া যাইবে; বাস্তবজীবনে এ প্রেম সফল হইবার অবসর তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তাই সে অনার্য্যসুত একলব্যের ন্যায় তাহার বাঞ্ছিতের মৃন্ময়-মূর্ত্তি পূজায় রত হইল। অর্জ্জুনের সমুজ্জ্বল হৃদয়স্বর্গে দাসীরূপে এক বিন্দু স্থান ভিক্ষা করিয়া যে একদিন নিরাশ হইয়াছে—সেই আজ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বচরাচর পার্থময় করিতে ব্রতী হইল। বনের কুসুম, বনচর জীব, গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল, আজ তাহার নিকট পার্থরূপে পূজা পাইতে

লাগিল। স্থাবর, জঙ্গম, কীট প্রভৃতি সকলের মধ্যে সে আজ অর্জ্জুনের সত্তা অনুভব করিতে লাগিল। আকাশে, বাতাসে আজ তাহার নয়নের সম্মুখে অর্জ্জুনের ছবি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বিহগের গানে, বনফুলসৌরভে, তটিনীর কলতানে, বনবালক-বালিকাগণের সঙ্গীত আলাপে, কুরঙ্গ-শশক-হংস-ময়ুরের নৃত্যকলাপে, সে অর্জ্জুনের রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ অনুভব করিল! সুখে দুঃখে, হরিষে বিষাদে, অর্জ্জুন তাহার অন্তর-বাহির জুড়িয়া রহিলেন। এমনি তন্ময়তা, এমনি "অর্জ্জুন"-ময়তা লাভ করিতে ক্রমশঃ শৈলজার হৃদয় হইতে কামনার করাল ছায়া ও আসক্তির প্রবল প্রলেপ মুছিয়া যাইতে লাগিল। পার্থকুমার অভিমন্যুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আজ সে তাই আর বাঞ্ছিতের বিরহজনিত কাতরতা অনুভব করিল না; বরং আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া তাহাকে নিবিড় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কহিল—

"————এস বৎস! বুকে;
তপস্যা আমার হইল সফল বুঝি!"

আজ তাই যখন কুমার বিদায় গ্রহণ করিল, রমণী কঠিন স্নেহের নিগড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেও বাষ্পগদগদকণ্ঠে অনুরোধ করিতে ভুলিল না—

"——————বাছারে!
জনক জননী কাছে বন-বাসিনীর
কহিও না কোন কথা এই তাপসীর,
কহিলে তপস্যা-ব্রত হইবে বিফল।"

তপস্বিনীর এই আত্মগোপনের মূলে কি কঠোর আত্মসংযম বিরাজ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই অনার্য্যা রমণীর চরণতলে আমাদের ভক্তিনম্র শির স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

অভিমন্যু চলিয়া গেলেন। সাফল্যের আশায় আশান্বিত হইয়া শৈলজা আবার পূর্ব্ববৎ সাধনা করিতে লাগিল। অনন্যমনে ভক্তিভরে এইরূপে পূজা করিতে করিতে চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে তাহার হৃদয় হইতে অর্জ্জুনের প্রতি সেই পতিভাব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল। সিন্ধুমুখী গঙ্গার ন্যায় এক অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি-পারাবারে তাহার হৃদয় নিমগ্ন হইল। তাহার প্রেমসিন্ধু দুকূল প্লাবিত করিয়া বেগবতী তরঙ্গিনীর ন্যায় বিশ্বের চারিধারে বহিয়া গেল। এক প্রেম বহুধা হইয়া তৃপ্তি লাভ করিল। শৈলজার বোধ হইল—

"কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা,
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার,
অভিন্ন উভয় কভু—নদী-পারাবার!"

পার্থ-উপাসিকার পার্থ-সাধনা সফল হইল—শৈলজা সাধনাবসানে এক মহান বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইল।

এই সময় একদিন ব্যাসদেব শৈলজার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ শৈলজাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তপস্বিনীর কঠোর সাধনার বিষয় তাঁহার অবিদিত রহিল না। তিনি শৈলজাকে কহিলেন—

"——————————শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থপূজা; পূজ তুমি এবে

পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম-পারাবার।
থাকে যদি কণা মাত্র কামনা উত্তাপ
হৃদয়ে নিবিবে ; শান্তি পাইবে পরম !"

শৈলজা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

"————চিন্তাতীত সেই ভগবানে
বুঝিবে, পূজিবে এই অবলা কেমনে
জ্ঞানহীনা ?"

ধীর-গম্ভীর স্বরে ব্যাসদেব কহিলেন—

"————বুঝ, পূঁজ, ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণও,—যুগ-অবতার ;
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়,
এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয়।"

কি সুন্দর সরল মীমাংসা—কি সহজসাধ্য সাধনার প্রণালী ! শৈলজা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির এই অমৃত-মধুর উপদেশবাণী সম্মুখে ধরিয়া কর্ত্তব্যের পথে আগুয়ান হইতে সঙ্কল্প করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠ তাহার তপস্বিনীর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"——বৎসে ! তব এই যোগিনীর বেশ,
একি বৈবতকের সে ভৃত্য বেশ তব ?"

শৈলজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

"————————না না প্রভু !
এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর।
অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞানসিন্ধু তব,
পাইবে না অনার্য্যা কি বিন্দুমাত্র তার ?

নারায়ণ! এই নব জলধর-ধারা
পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল?
পাইবে না মরুভূমি? দেহ এ দাসীরে
এক বিন্দু; বিলাইয়া বনে বনে, দাসী
করিবে এ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন।"

অনর্য্যা রমণীর এই পতিতোদ্ধাররূপ মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের কামনা লক্ষ্য করিয়া আর্য্য ঋষিপ্রবরের অন্তর গলিয়া গেল! তিনি সজল নয়নে কহিলেন—

"——————চন্দ্রচূড় সুতে!
গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত
পতিতপাবন নাম; অনার্য্য উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।"

তপস্বিনী অশ্রুজলে ব্যাসদেবের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কহিল—

"——————কর মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যায়,
পদ-কল্পতরু মূলে বন-লতিকায়
দেও স্থান; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।"

ব্যাসদেবের বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া আনন্দের মন্দাকিনীধারা বহিয়া গেল। তিনি আদরে তপস্বিনীকে বুকে লইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"————মা! আমার! নিরুপমা এই
জ্বলন্ত পাবকশিখা পশিলে আশ্রমে
পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম।"

স্থূলতঃ বিচার করিতে গেলে ব্যাসদেবের এই উক্তিটী কেমন বিসদৃশ ঠেকে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ঋষিপ্রবরের এই উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিয়া আমরা কবির চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ শৈলজার কঠোর আত্মসংযম; অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়জয় ও অলৌকিক আত্মনিবেদনের শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একটা উজ্জ্বল ধারণা করিতে পারেন নাই তাহা নহে; যে রমণী অথবা যে "নিরুপমা জ্বলন্ত পাবক শিখা" একদিন রৈবতকে পার্থপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া পিতৃহন্তা পার্থের কৃতজ্ঞতামূলক বাৎসল্য-স্নেহোচ্ছাস নিবারণ করিতে পার্থের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং অবশেষে নিজে মুখ ফুটিয়া সেই অন্তর-অন্তরের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই—সেই রমণী যে আজ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কামনা ও আসক্তিমূলক পতি-প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া সিন্ধুমুখী গঙ্গার ন্যায় এক অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রীতি-পারাবারে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেছে—সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেবের ইহাও অবিদিত ছিল না। তবে মানবমাত্রেরই সকল জয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জয় চিত্তজয়; এবং এই চিত্তজয়ের প্রথম ও চরম সোপান কাম জয়। কেননা কাম জয় করিতে না পারিলে—মানবের এই দুর্দ্দমনীয় রিপুর দমন সাধিত না হইলে, তাহার অন্যান্য সৎবৃত্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হয় না; এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয় চিত্তজয়ের অবসরও তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং যে প্রবল রিপুর দমনে কত যোগী ঋষিরও পদ-স্খলন ঘটিয়াছে—শৈল সাধনার পথে যে সেই উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিবে ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে মহর্ষির আশ্রমবাসী শিষ্যসেবকবর্গও যে সেই রিপুর প্রবল হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, এ বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক

নহে। সুতরাং স্বাভাবিকতার হিসাবে কবির এই উক্তি ব্যাসদেবের মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক ব্যাসদেবের এই উক্তিতে শৈলজা সরমে মরিয়া গেল। সে অধোমুখে ধীরে উত্তর করিল—

'————অর্জ্জুনের ভৃত্য আমি!
হবে তব শিষ্য, পুত্র, সেবক তোমার।"

ব্যাসদেব তাহাকে চরণাম্বুজে স্থান দান করিলেন। শৈলজা সেবক, শিষ্য বা পুত্রের ন্যায় তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সান্ধ্যসময়ে ঋষিপ্রবর শৈলজাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সান্ধ্যরবিকরে সেদিন শরতের নীল নির্ম্মল আকাশ উদ্ভাসিত! মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দিবা অবসানে এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! উর্দ্ধে শরতের শেষ মেঘ সেই নির্ম্মল আকাশে তরঙ্গায়িত—আর নিম্নে মহাভারতের রক্তসিন্ধু যেন গর্জ্জন করিতে করিতে ভীম বেগে ছুটিয়াছে! বিশ্বচরাচর নীরব, নিস্পন্দ, ভীত! রণ-পয়োধির উভয় প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির যেন তরঙ্গায়িত বেলাভূমির ন্যায় শোভমান! অসংখ্য মৃত্যুজিহ্ব বিদ্যুৎগতি অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাতে কালানল উদ্গীরিত হইয়া যেন কুরুক্ষেত্রকে এক বিকট শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। বাতক্ষুব্ধ সমুদ্র-হুঙ্কারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শুধু মর্ম্মভেদী হাহারব—শুধু যেন প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য ও অট্টহাসি!

দূরে এক বিশাল বটবিটপিছায়ায় দাঁড়াইয়া দ্বৈপায়ন কহিলেন—

"————দেখ বৎস! পৃথিবী আবার
হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিতধারায়!"

শৈল সভয়ে কম্পিতচিত্তে একবার নিমেষ মাত্র সেই সংহার-লীলা দেখিল; কিন্তু পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নতনেত্রে কহিল—

"কি ভীষণ দৃশ্য! প্রাণ কাঁপে থর থর;
নরকের দৃশ্য যেন সম্মুখে বিস্তৃত!
এই পাপ দৃশ্য প্রভু! দেখিলেও হায়!
হয় চিত্ত কলুষিত।"

তাহার মনে হইল, নির্ম্মম হিংস্রজন্তুর ন্যায় নিষ্ঠুর-প্রকৃতি যে সকল বীর সর্ব্বদা পরস্পরের নিধন প্রয়াসে রত, তাহারা যদি মানব হয় তাহা হইলে মানবে ও শমন-কিঙ্করে প্রভেদ কি? এই পাপক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আবার ধর্ম্মক্ষেত্র? সে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল-

"————নিষ্ঠুর মানব,
এইরূপে নিরমম হিংস্র জন্তু প্রায়
নাশে কি হে পরস্পরে? একি অসম্ভব
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত হায়!
পাপক্ষেত্রে!—এ নরক—"

"হায় যদি প্রভু!
এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আর?
কেশব, করুণাসিন্ধু, বিষ্ণু অবতার—
জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্ম্মসংরক্ষণ
যাঁর মহাধর্ম্মনীতি—এই কার্য্য তাঁর?"

দ্বৈপায়ন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জগতের নীতি—
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। হিংসা আর প্রীতি
ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময়।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই পাপ-অভিনয়ে
শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর-হৃদয়,
দয়ার সাগর তিনি, পুণ্য-পারাবার !
নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
নাশিছেন প্রিয়জন দেখ কত মতে
হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস !
সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ ;
ধ্বংস বিনা সৃষ্টি, স্থিতি, বৎস ! অসম্ভব !
ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ
নাহি সাধ্য তৃণ অন্য হইবে উদ্ভব !
রুদ্ধ কর মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্দ্ধিত,
জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত।"

শৈলজা মহর্ষির যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু তাহার কোমল প্রাণ তথাপি ধ্বংসনীতির সার্থকতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ভাবিল, সৃজন পালন যাঁহার মায়া, ধ্বংসও তাহার মায়া হইতে পারে ; কিন্তু আমি যখন একটি বালুকণিকা সৃজন করিতে পারি না, তখন আমার ধ্বংসে অধিকার কি ? আমি কে ? আত্মসমস্যার গভীর রহস্যজাল ভেদ করিবার বাসনা রমণীর হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল—

"————————আমি কে ?"

ব্যাসদেব ধীরগম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"তাঁহার অস্ত্র ! সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
যেই নীতিচক্রে নিত্য হতেছে সাধিত,
তুমি পরমাণু তার ; সেই নীতিচক্রে
সকলের কর্ম্মক্ষেত্র আছে নিয়োজিত ;

স্বয়ং নির্লিপ্ত তিনি। এই নীতিবলে
শার্দ্দুল নাশিয়া বৎস! ক্ষুদ্র প্রাণী যত
পড়িছে শার্দ্দুলাধিক কালের কবলে।
আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
জীবদের হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার।
এই নীতি অনুসরি যদি নিয়োজিত
কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার?"

শৈল নিবিষ্টচিত্তে সকল কথা শুনিল বটে; কিন্তু তথাপি এই নীতির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। শুধু আবেগভরে কহিল——

"নিগূঢ় সংসার তত্ত্ব! হায়! ক্ষুদ্র নর
কেমনে বুঝিবে তাহা কে বুঝাবে তারে?
শুনিয়াছি দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার;
এই ধ্বংস যজ্ঞ প্রভু! ধর্ম্মশিক্ষা তাঁর?
জীবে দয়া—জীবহিংসা? সর্ব্বজীবহিত
সর্ব্বজীবের বিনাশ? এই মহারণ—
কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র? প্রভু! উৎপাটিত
করিলে কি এই তরু, হবে সংরক্ষিত?"

মহর্ষি শৈলের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে এই নিগূঢ় সংসারতত্ত্ব বুঝিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শৈল বুঝিতে পারিল——

"মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-রত্নাকর!
ভাসি এই অনন্তের মহা পারাবারে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজনগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,

ধর্ম্মশাস্ত্র নাম তার। শাস্ত্র অধ্যয়ন,
যোগবল, মানবের শিক্ষার সোপান।"

আর বুঝিল—

"বিপ্লব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম্ম-যুগের সঞ্চার।
এই ধ্বংস-যজ্ঞ ধর্ম্ম। * *
সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, দুষ্কৃত, দুর্জ্জন
বর্ষিতেছে নিরন্তর পাপ-হলাহল।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, এই পাপ ভার
করিতে মোচন—করিতে প্রচার
মহারাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য—করিতে প্রচার
ভারতে **মহাভারত**—কৃষ্ণ অবতার।"

মহর্ষি শৈলজাকে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। কংসের নিধন, বসুদেবের কারামুক্তি, উগ্রসেনে রাজ্য দান, জরাসিন্ধু-বধ, রাজমেধ যজ্ঞ নিবারণ, রাজসূয় যজ্ঞাবসানে বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবের প্রবল সাম্রাজ্য স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের নির্লিপ্ততা, দয়া-ধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উদার, মহান, নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ প্রদান করিলেন। আর বুঝাইয়া দিলেন যে এই বিরাট সংহার-লীলার অভিনয় যে শুধু তিনি ইচ্ছা করিয়া করিতেছেন তাহা নহে, পরন্তু—

"সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
সাধিবারে অনিবার্য্য (এই) ধর্ম্মরণ।"

শৈলজা সাগ্রহে মহর্ষির মুখে সেই কৌতুহলপূর্ণ জীবন-নাট্য-বৃত্তান্ত শুনিল, কিন্তু তাহার মনে আবার একটা নূতন খট্‌কা আসিয়া

উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের নির্লিপ্ততা সম্বন্ধে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিস্ময়ে ও ব্যাকুলভাবে সে প্রশ্ন করিল—

"ঘোরতর কর্ম্মলিপ্ত অবতার তাঁর
দেখিতেছি ভগবন্! বুঝিব কেমনে
ঈশ্বর নির্লিপ্ত তবে?"

ব্যাসদেব কহিলেন—

"কি ভ্রান্তি তোমার!
কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম!
জগতের সুখ মাত্র সুখ আপনার
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
রয় কর্ম্ম মূলে—কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার—নির্লিপ্ত সে জন।"

দেখাইয়া দিলেন—

"নিষ্কাম বা নির্লিপ্তের আদর্শ উজ্জ্বল
কৃষ্ণের জীবন-চিত্র, পবিত্র, নির্ম্মল।
আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার?
নারায়ণ নারায়ণী সেনা আপনার
দেখ প্রতিকূল পক্ষে—বীর অদ্বিতীয়
ভারতের—সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি!"

শৈলজার সকল সংশয় যেন এইবার নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া গেল। ভক্তি ও আনন্দের অশ্রুধারায় তাহার গণ্ডস্থল বিধৌত হইল। সে নীরবে আনতবদনে যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ধ্যান করিতে

করিতে তন্ময় হইয়া গেল। ঋষিশ্রেষ্ঠ সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে তাঁহার সঙ্কলিত গীতামৃতের পরিচয় দিয়া কহিলেন—

"কাতর অর্জ্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
সেই ধর্ম্মগীতামৃত করাইয়া পান
করিলা স্বধর্ম্মরত—যোগধ্যান করি
করিয়াছি সঙ্কলন—পরিতৃপ্ত প্রাণ;
সেই **গীতা** উত্তরীয় অঞ্চলে তোমার।"

এবং সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি পাণ্ডবশিবিরে অর্জ্জুন-পত্নী সুভদ্রার হস্তে মহর্ষির আশীর্ব্বাদ সহ সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। বলিয়া দিলেন———

"————————শান্তনু-তনয়
এই গীতামৃত তরে আকুল হৃদয়।
কহিও ভদ্রারে—"যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
"সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
"তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী—
"এই গ্রন্থে, সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
"বিরাজিত যেই চন্দ্র, সুধার আধার
"তব বক্ষে, এই **গীতা**, জোৎস্না তাহার।"

শৈলজা সেই সুদুর্লভ দেববাঞ্ছিত 'গীতামৃত' খানি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া সত্বর পাণ্ডবশিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল বটে, কিন্তু কে যেন তাহার পদদ্বয় চাপিয়া ধরিল। তাহার বক্ষের মধ্যে যেন একটা অব্যক্ত বেদনাময় আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন সে অনুভব করিল। তাহার মনে হইল অন্ধ, দিক্‌ভ্রান্ত মানবকে অনন্তকাল ধরিয়া গন্তব্য পথ দেখাইতে যদি গীতা-জোৎস্নার আবির্ভাব—তাহা হইলে

অজ্ঞ, অসহায়, অসভ্য, অনার্য্য-জাতির উদ্ধারব্রতে, তাহাদের জীবনব্যাপী নিরাশার ঘোরান্ধকার মোচনে তাহা কি ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ত অনার্য্যোদ্ধারব্রত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। রমণী ম্লানমুখে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্তর্য্যামী ঋষিপ্রবর শৈলের হৃদয়ের এই সংশয়মূলক সমস্যা ধারণা করিতে পারিয়া কহিলেন—

"যাও বৎস! যাও চলি। যথা অবসর
করিব যত্নেক শিষ্যে এ অমৃত দান।
মিলিয়াছে মোক্ষ-সুধা, যুগযুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান।
মানবের কর্ম্মাকাশে ধর্ম্ম-ধ্রুবতারা
জানিলাম এতদিনে হ'ল সমুদিত;
অনন্তকালের তরে অন্ধ, দিক্-হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত।"

শৈলজা পবিত্র গীতামৃত লইয়া পাণ্ডবশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎকল্পে কহিল—

"জয় সুভদ্রার জয়। অর্জ্জুন মহিষীর জয়।"

জনৈক সখী আসিয়া ভদ্রাকে সংবাদ দিলেন—

"মহর্ষি শিবির দ্বারে ব্যাস শিষ্য একজন।"

ব্যস্তভাবে ভদ্রা কহিলেন—

"————আন পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া তাঁকে।"

সখী আসিয়া শৈলকে ভদ্রার সমীপে লইয়া গেলেন। ভদ্রা দেখিলেন—

"——————ওকি মূর্ত্তি মনোহর!
নীলোৎপল প্রতিমায়, জাগিতেছে যৌবনের
কি মধুর প্রথম স্বপন!

* * *

সুন্দর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি
সুকুমার দেহ মনোহর,
ললাটে চূড়ার মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি
অমার্জ্জিত ধূলায় ধূসর ;
সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে
আকর্ণবিস্তৃত ছল ছল,
ভাসিছে যুগল তারা নিলীম প্রভাতাকাশে
দুই শুক-তারা সমুজ্জ্বল ;
কি তারায়, কি নয়নে শান্ত স্থির সে বদনে
ক্ষুদ্র সেই অধর কোণায়,
কি ত্রিদিব-কোমলতা কি ত্রিদিব-স্নেহকথা
হৃদয়ের ভাসিতেছে হায় !"

সুভদ্রা ছদ্মবেশী ব্যাস-শিষ্য শৈলের রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি শৈলজাকে প্রণাম করিতে যাইতে যুবকবেশী শৈল শশব্যস্তে তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিল—

"যে ধর্ম্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্ত্তি তার,
দেবি ! তুমি নমস্যা আমার।"

শৈলের কণ্ঠ বহুদিনবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায় সুভদ্রার অন্তরের অন্তরে কি যেন এক আবেশমাখা ভাবের লহরী বহাইয়া দিল।

'সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, ত্রিতন্ত্রীর সে মূর্চ্ছনা,
স্মৃতির কি সঙ্গীত অতীত—
যেন সুভদ্রার কাণে, যেন সুভদ্রার প্রাণে,
বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত।'

সুভদ্রা আত্মহারা হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

"————————————তপোধন
আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র
পুনর্ব্বার কার পদার্পণ।"

শৈল নতমুখে উত্তর করিল—

"————————সান্ধ্যকৃত্য করি শেষ
করিবেন শুভ আগমন।
গোধূলিরে পদধূলি দিয়া উদিবেন দেবি!
ঋষিকুলে নক্ষত্র প্রথম।"

তারপর ধীরে ধীরে আপনার উত্তরীয় হইতে 'গীতামৃত' খানি মুক্ত করিয়া সুভদ্রার করে অর্পণ করিয়া কহিল——

"যে ধর্ম্মের আত্মা কৃষ্ণ, বাহুবল ধনঞ্জয়,
জ্ঞানবল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
দেহ যার মূর্ত্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি
পুণ্যময়ী প্রেম-প্রস্রবণ—
এ পবিত্র মহাগীতা, তার সুধাময়ী ভাষা
আশীর্ব্বাদ সহ উপহার,
বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে
সুধাকরে সুধার ভাণ্ডার।"

আবেগভরে কহিল—

"মানব অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী
গীতামৃত করি বিকীরণ,
সুশীতল জ্যোৎস্নায় জুড়াও জগতারাধ্যে!
জগতের তাপিত জীবন"!

সুভদ্রা দ্বৈপায়ন উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গ্রন্থখানি শিরে ধারণপূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখিয়া দিলেন। তার পর—

"উভয় নীরব পুনঃ উভয়ের হৃদয়েতে
ভাসিয়াছে কি যেন উচ্ছ্বাস!"

শৈল দেখিল——

"————নেত্র ছল ছল সুভদ্রার
কি করুণা করিছে বিকাশ!"

তাহার মুখে আর কথা সরিল না—সে সজলনয়নে ধীর নম্র-পাদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুরুক্ষেত্রে শৈল-সুভদ্রার এই সর্ব্বপ্রথম সম্মিলনে নিতান্ত পরিচিতের মধ্যেও অপরিচয়ের একটা ব্যবধান রাখিয়া কবি অতি নিপুণতাসহকারে অল্প কথায় শৈলজার সংযমশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুনগতপ্রাণ অথবা 'অর্জ্জুন'ময় শৈলের সমীপে সুভদ্রা আজ যে "নমস্যা দেবী," ইহা কোমলস্বভাবা নারীর অল্প-শক্তির পরিচায়ক নহে! শৈল নারী হইলেও সে যে সাধারণশ্রেণীভুক্তা নহে, ইহা আমরা এস্থলে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।

আর একদিন গভীর নিশীথকালে শৈলজা মহর্ষি ব্যাসদেব সহ ভীষ্মের শিবিরে গিয়া উপনীত হইল। ঋষিশ্রেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর শৈলজাকে বিদায় দিলেন। শৈল ভীষ্মের শিবিরদ্বার হইতে অদূরবর্ত্তী আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই সে দেখিল এক যোগিনী কৌরব-শিবিরে অলক্ষিতে যাইতেছে! শৈলজার হৃদয়ে যুগপৎ এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। সে ত্রস্তপদে অলক্ষিতে তাহার অনুগমন করিয়া অন্তরালে থাকিয়া যে রোমাঞ্চকর গুপ্ত-মন্ত্রণা শুনিল, তাহাতে তাহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সে সেই নীরব, নিদ্রিত, চন্দ্রপ্রদীপ্ত প্রান্তরে বসিয়া শোকোন্মত্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল—

"বাছা! তুই বারিবিন্দু ত্রিদিবপ্রসূত
পড়েছিলি আসি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে।
আমার হৃদয়-মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
নিতেছে কাড়িয়া হায়! নির্দ্দয় তস্কর—
সহিব কেমনে আমি? হায়! বাছা মোর!"

শৈলজা শুনিল—কৃষ্ণদ্বেষী ঋষি দুর্ব্বাসা, পার্থপুত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার নিমিত্ত যোগপ্রভাবে বীরবর কর্ণকে উত্তেজিত করিয়াছেন; কর্ণ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে তিনি অচিরে কুমারকে ন্যায় কি অন্যায় যুদ্ধে যে করিয়া হউক নিধন করিবেন। প্রতিশ্রুতির প্রধান কারণ কর্ণের প্রতিহিংসা। কর্ণ জানিতেন না যে তিনি "কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র দুর্ব্বাসার!" তিনি বিস্ময়বশে ভাবিতেন—সূতনন্দন তাঁহার এ রাজালিপ্সা কেন?

"———কেন এই ভুজে বল? কেন হৃদয়েতে
রাজ্য আশা; এ জিগীষা, পিপাসা দারুণ?
এ দারুণ অভিমান?"

কিন্তু আজ যখন দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—

"—————শিষ্য কুন্তী ভোজ
করেছিল কন্যা কুন্তী আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সেবায়—
পুত্রার্থী। একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজ গৃহে; পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।
আকর্ষিল মন্ত্রবলে কুন্তী সবিতায়,
জনম হইল তোর। পাপীয়সি মাতা,
নিষ্ঠুরা—সলিলে তোরে করিলা নিক্ষেপ;

শিষ্যা রাধা সযতনে করিলা পালন।
* ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, সুশাণিত ক্ষত্রিয় কৃপাণ,
দেখিলাম যোগবলে, হবে প্রয়োজন॥
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
ক্ষত্রিয়নন্দন বলি করিনু অর্পণ
শিক্ষার্থে। দুর্ব্বাসা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
।র নন্দন তুই—মন্ত্র-পুত্র মম-

তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তিনি "কুন্তীর কানীনপুত্র—পুত্র দুর্ব্বাসার।"

দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় ইহাও বুঝিলেন—

"————————যে জননী
নিক্ষেপিল জলে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান,
মাতা নহে, রাক্ষসী সে। তার পুত্রগণ
পিতৃশত্রু, শত্রু মম, নহে সহোদর।"

সুতরাং তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার তীব্র অনল জ্বলিয়া উঠিল। অধিরথসুত, পিতা ও গুরু দুর্ব্বাসার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—

"————————অবশ্য করিব রণ!"

* * *

"এই চলিলাম মাতঃ! নিক্ষেপিলে জলে
যেই পুত্রে, পুত্রহীন করিয়া তোমায়
ভাসাইবে অকূল মা! শোকের সাগরে।
মুদ আঁখি, চন্দ্রদেব! তব বংশধর
চলিল নির্ম্মূল বংশ করিতে তোমার!"

দুর্ব্বাসা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—

"পাণ্ডবের দুই ভুজ—কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়।
ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,
উন্মত্ত, কটাক্ষে করি ধ্বংস কুরুকুল,
বিশ্বত্রাস বজ্রাগ্নিতে তৃণ রাশি যথা
হইবেক অবসন্ন। কাটিবে হেলায়
সপাণ্ডব এক ভুজ তুমি পরাক্রমে ;
নিক্ষেপিব অন্য ভুজ পশ্চিম সাগরে।
কর্ণের সাম্রাজ্য ধ্বজা উড়িবে উজ্জ্বল !"

বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে পার্থনন্দনকে—

"একা কর্ণ, একা দ্রোণ, নাহি পারে যদি
দ্রোণ কর্ণে মিলি তবে করিবে সমর।
নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে ; বধে যেই মতে
মৃগেন্দ্র ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ,
আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন।"

শৈলজা এই ভীষণ ষড়যন্ত্র শুনিয়া, এই ঘৃণিত ব্যাধবৃত্তির ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। সে এই গুপ্ত-মন্ত্রণার কাহিনী শুনিল বটে, কিন্তু কি করিলে এই শিশু-রক্তপাত—এই দুঃসহ বজ্রপাত নিবারিত হইবে. তাহা সহসা স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া এই অনর্থ নিবারণ করিবে ; কিন্তু—

"——————হিমাদ্রির
পাদমূলে পিপীলিকা, সিন্ধুপদতলে
বালুকা, দুঃখের কথা কহিবে কেমনে ?

এই ষড়যন্ত্র হায়! * * * *
* * * *. হইলে প্রকাশ
নাগরাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাসুকির
ডুবিবে অতল জলে সহ বাসুকির—
থাকিবে না অনার্য্যের একটি আশ্রয়।"

তাহা হইলে ত তাহার অনার্য্যোদ্ধারব্রত অপূর্ণ রহিয়া যাইবে! যে ব্রত তাহার জীবনের লক্ষ্য, জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার সুখ-স্বপ্ন, সেই পুণ্যব্রত সফল না হইলে যে তাহার নারীজন্ম বিফল হইয়া যাইবে! তবে কি শৈল পার্থের কাছে যাইবে? তাই বা কেমন করিয়া হয়? শৈলকে দেখিলে যে পার্থের অনুতাপানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিবে—তিনি যে অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিবেন—সে বেদনা, সে অনুতাপের কারণ শৈল যে প্রাণ থাকিতেও হইতে পারিবে না। শৈল কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিল। একবার মনে হইল, কুমারের কাছে যাইবে। কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল ফলিবে? তাহাকে কি সে এই যুদ্ধে নিবৃত্ত করিতে পারিবে? যে তরুণ ভাস্কর দশদিক আলোকিত করিয়া ক্ষত্রিয়াকাশে সমুদিত হইতেছে, তাহাকেই বা সে কেমন করিয়া নিবৃত্ত করিবে? মৃগয়ার প্রমত্ত উত্তেজনায় নক্ষত্রের মত যাহাকে সে ঘোর বিপদের মুখে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে, আজ তাহাকে সে কেমন করিয়া এই সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে? আবার নিবারণ করিতে না পারিলেও এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া হয় ত সেই বীরশিশুর হৃদয়ে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা জাগিয়া তাহার হৃদয়ের বল হরণ করিতে পারে—বনমাতা হইয়া তাহাই বা সে কেমন করিয়া দেখিবে? শৈলজা আর ভাবিতে পারিল না। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অসীম আকাশতলে এক শিলাখণ্ডে বসিয়া ক্লান্তমনে সে নিদ্রিত কুরুক্ষেত্রের শোভা দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—

"হায় মা! হায় মা! শিবে শান্তিস্বরূপিনী!
দিবসে তুমি মা গৌরী, মাগো! রজনীতে
কৃষ্ণভাগে তুমি কালী, শুক্লভাগে শুভ্রা,
জ্যোৎস্নাবরণী মাগো, তুমি সরস্বতী!
সর্ব্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর!
তবে কেন তব এই জগতে জননী!
এতই অশান্তি আহা! এত বজ্র ঝড়?
সর্ব্বাণী! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
জানি, তুমি নিত্যা, আর অনিত্য জগত।
কিন্তু করিলে না কেন জগত তোমার
অনন্ত শান্তির ছায়া? শান্তিতে জন্মিয়া,
শান্তিতে এ পান্থশালে কাটিয়া দুদিন,
যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া।"

শৈলজা ক্ষণেকের নিমিত্ত যেন এই চিন্তার ফলে এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিল। তাহার অকূলে কূল মিলিল; সে স্থির করিল—

"না না, যাব দয়াময়ী সুভদ্রার কাছে।
মায়ের করুণ প্রাণ হইবে কাতর——
করিবে বারণ, আশা হইবে সফল।"

শৈলজাচরিত্রের বিকাশ পরিস্ফুট করিতে গিয়া চরিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত কবির কবিত্বকৌশল এখানে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রার সহিত শৈলজার সাক্ষাৎ ঘটাইতে না পারিলে এক দিকে যেমন শৈলজার চরিত্রশক্তির পরিচয় লাভের অবসর ঘটে না, অন্য দিকে তেমনই কবিরও কাব্যকলাশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় না পাইয়া আমাদিগকে ক্ষুন্ন হইতে হয়। কলানিপুণ কবি কিন্তু আমাদিগের সে সাধ মিটাইতে ত্রুটি করেন নাই। যে সুভদ্রা শৈলজার স্বপ্ন-স্বর্গ

অর্জ্জুনের দয়িতা—যাঁহার নিমিত্ত শৈলের বড় সাধের অমিয়-সাগর আজ ভাগ্যদোষে গরলক্ষেত্রে পরিণত—যিনি তাহাঁকে তাহার নিজ-হাতে-গড়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া, নিরাশার দাবদাহে দগ্ধ করিয়া, আজ যৌবনে যোগিনী করিয়া তুলিয়াছেন—সেই সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে শৈলজার হৃদয়ের বল ত বুঝিতেই পারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে কবি কোন্ সূত্রে, কিরূপ কৌশলে, ঘটনাচক্রে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত শৈলজার মিলন সঙ্ঘটন করিলেন, তাহাও উপলব্ধি করিয়া আমরা কবির সৃষ্টিকৌশলে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বিশ্বপ্রেমসাধননিরতা শৈলজা বুঝিতে পারিয়াছিল, যে সুভদ্রার সহিত সম্মিলন তাহার হৃদয়ের কঠোর সংযম-পরীক্ষা মাত্র—আর এ পরীক্ষার মূলে তাহার গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসের অভিপ্রায় বিরাজমান; নতুবা এমন অঘটন-ঘটন কখনই হইতে পারিত না। কিন্তু এখন আর শৈলজার পূর্ব্ববৎ সে হৃদয়দৌর্ব্বল্য নাই—সে কলুষিত বাসনা নাই; সুতরাং গুরুর পরীক্ষায় সেও হটিবে কেন?

সে কহিল—

"গুরুদেব! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
পাঠাইলে অপরাহ্ণে ভদ্রার শিবিরে?
আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিনু পালন।
ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কঠিন
লইব; হৃদয়! চল যাইব যথায়
নিদ্রিতা পার্থের বক্ষে, ত্রিদিবে আমার,
প্রেমময়ী ভদ্রাদেবী, নিদ্রিতা এখন,
স্থিরা হিরন্বতী বক্ষে জ্যোৎস্না যেমন!
দেখিব, একটি শিরা কাঁপে কি তোমার,
পড়ে কিনা অনু মাত্র ছায়া কামনার
তোমার তরল বক্ষে।"

শৈলজা চলিল—তরল সলিলের মত তাহার রমণী-হৃদয় আজ নির্ম্মল ও নিশ্চল হইতে পারে কিনা তাহাই দেখিতে পার্থের শিবির-পানে সবেগে ছুটিল। দ্বারদেশে দ্বৈপায়ন-শিষ্য দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে দ্বার মুক্ত করিল। শৈলজা শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব যোগিনীবেশ ধারণ করিল। তারপর ধীরে ধীরে পার্থের কক্ষে প্রবেশ করিল।

শৈলজা, দেখিল তখনও স্বর্ণ আধারে দীপ জ্বলিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। স্বর্ণপ্রতিমা সুভদ্রা দেবী স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে সুষুপ্তা। দক্ষিণে নীলমণিময় নিরুপমবীরমূর্ত্তি ধনঞ্জয় নিদ্রিত। সুভদ্রার অতুল বদন নীলাকাশে পূর্ণ শশধরের ন্যায় অথবা মানসসরসে একটি বিকচ কমলের ন্যায় পতিবক্ষে শোভা পাইতেছে। উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রাগত; যেন জ্যোৎস্না মেঘকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে—সৌন্দর্য্য শৌর্য্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—জাহ্নবী হিমাদ্রিকে বেষ্টন করিয়া আছেন! উভয়ে নিদ্রিত; অথচ নিদ্রাতেও উভয়ের অধরে ঈষৎ হাসির রেখা—যেন উভয় উভয় ধ্যানে মোহিত! শৈলজা দেখিল বটে, কিন্তু প্রথম দর্শনে নয়ন ভরিয়া সে রূপরাশি দেখিতে পারিল না। তাহার চক্ষু সে বিষয়ে বাদ সাধিল; যোগিনীর সংযত হৃদয় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কাঁপিয়া উঠিল! তাহার মনে হইল, অনন্ত ভূধর-ভারে স্থির, অবিচল ভূতলও যেন সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল! শৈলজা দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিল—

"————————————হা হত হৃদয়!
একি কম্প কামনার? না না প্রাণনাথ!
করিয়াছি চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার
আরাধনা; দেও শান্তি, শান্তিপূর্ণ বুকে
নিরখিব দেবমূর্ত্তি মম তপস্যার।"

সহৃদয় পাঠক ! এই স্থানে ব্যাসদেবের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কামূলক উক্তিটুকু মিলাইয়া দেখিবেন। যাহা হউক, শৈলজার কাতর প্রার্থনা যেন তাহার ইষ্টদেবের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। রমণীর হৃদয় ভক্তিভরে অবিচল হইল। তাহার নীলাব্জবদন শান্ত স্থির; দুনয়ন আনন্দাশ্রুপূর্ণ! মুহূর্ত্ত পরে শৈল স্বীয় নীলোৎপলসম কর দুইখানি ভদ্রার রক্তোৎপলনিভ চরণে অর্পণ করিল। ভদ্রা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া পদপ্রান্তে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

তারপর—

"———————রহিলা চাহিয়া
উভয় উভয় পানে। উভয় মোহিতা
উভয়ের দরশনে; চাহি পরস্পরে—
জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নামাখা সরসী নীলিমা;
জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্তা, স্থিরা, জাহ্নবী যমুনা;
যোগিনী ও যোগারাধ্যা, শান্তি তপস্যায়,
বনদেবী গৃহলক্ষ্মী, দয়া দরিদ্রতা।
চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা কল্পনা।"

সুভদ্রার সহিত শৈলজার এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনে গীতাগ্রন্থ প্রদানকালে শৈল ছদ্মবেশে ভদ্রার শিবিরে গমন করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহার সহিত আমরা এই সাক্ষাৎলাভের আনন্দ তুলনা করিয়া দেখিলেই কবির প্রযোজ্য মধুর উপমাবলীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রথম দর্শনে শৈল সরমসঙ্কোচনতা কুন্দকলি—তাহার সুকুমার অঙ্গে তখন যৌবনের সুমধুর প্রথম স্বপ্ন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! সুতরাং লজ্জা ও বুকভরা উচ্ছ্বাস আসিয়া তাহার

দেখার সুখে বাদ সাধিয়াছিল। এই জন্যই সুভদ্রা-সখী, চতুরা সুলোচনা সেদিন শৈলের ছদ্মবেশ সহজে বুঝিয়া লইয়া তাহার শিবির ত্যাগকালীন বলিয়াছিলেন—

"————এর ঋষিপনা বল, ভদ্রা
করি আমি এখনি বাহির।
এ যদি সে শৈল নহে, নহি আমি সুলোচনা"

কিন্তু আজ আর শৈলজার সে সরম নাই, সঙ্কোচ নাই। যোগিনীর হৃদয়ে আজ আর সে বাসনার প্রবল তুফান কূল উছলিয়া উঠে না। আজ মহর্ষির কৃপায় তাহার হৃদয় ভক্তিভরে অবিচল—আজ সে—

"বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধ অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

আজ তাই সুভদ্রা উঠিয়া বসিতে যোগিনী অধরে অঙ্গুলি সন্নিবেশ পূর্ব্বক সঙ্কেত করিয়া তাহার সহিত বাহিরে আসিবার কামনা করিল। ভদ্রা আদরে তাহাকে বক্ষে লইয়া বাহিরে আসিলেন; এবং জ্যোৎস্নাধবলিত হিরণ্মতীতটে বসিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শৈলও ভদ্রার সেই স্নেহস্বর্গে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু উভয়ের অশ্রুতে কত প্রভেদ!

"————অশ্রু কত রূপান্তর!
শোকাশ্রু ভদ্রার, সুখ-অশ্রু যোগিনীর।
ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখখানি
রাখে বুকে চিরদিন। চাহে তপস্বিনী
চিরি বুক, সেই বুকে, স্নেহের ত্রিদিবে
পড়ে ঘুমাইয়া সুখে চিরদিন তরে।"

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। উর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশে নব হেমন্তের নির্ম্মল শশধর সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিলেন—নিম্নে অশান্তির মহামূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র, বিরাট শরীরে যোজন যোজনান্তর ব্যাপিয়া ঝটিকান্তে সুপ্ত সমুদ্রের ন্যায় নীরব নিদ্রিত! ভদ্রা শৈলকে বুকে আঁটিয়া লইয়া অদূরে এক বকুলতলায় গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার বাম অংসোপরে শৈলজা মুখখানি স্থাপন করিয়া রহিল। করুণার সিন্ধু ভদ্রার হৃদয় তখন স্মৃতির প্রবল আঘাতে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত; সুতরাং সহসা তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া তিনি উচ্ছ্বাসভরে স্নেহতরলিত কণ্ঠে কেবলমাত্র কহিলেন—

"————————শৈলজে! ভগিনী!
চির অভাগিনী!"

তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শৈল ভদ্রার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"————————সে কি কথা দেবি!
ভদ্রার ভগিনী, স্নেহভাগিনী পার্থের
অভাগিনী যদি, তবে সুভাগিনী আর
কে আছে জগতে দিদি! শৈলজা তোমার
বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
নির্গন্ধা অপরাজিতা দেবপদাশ্রিতা।"

সত্যই ত! কাননান্তরালের প্রস্ফুট নির্গন্ধা অপরাজিতা যে আজ সত্যই দেবপদাশ্রিতা! আজ শৈলের ন্যায় পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী কে? শৈল ত আজ সে **শৈল** নহে!

"সে নীলাব্জ কলি, আজি ফুটন্ত নলিনী!
সে পঞ্চমী, আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী!"

শৈলের হৃদয়ে আজ যে পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি ও সরলতা বিরাজ করিতেছে—শৈলের কোমল প্রাণে, কোমল শরীরে আজ যে প্রাণ কোমলতা, উজ্জ্বল লাবণ্য শোভা পাইতেছে—তাহার তুলনা কোথায় মিলিবে ?

ভদ্রা স্নেহভরে সেই অপরাজিতার ক্ষুদ্র মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। চন্দ্রকরতলে দেখিলেন, শৈলের যুগল নয়ন আনন্দাশ্রুপ্লাবিত। তাহার অধরে ঈষৎ আনন্দ হাসি ভাসিতেছে।

"সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
চন্দ্রাভ আকাশখণ্ড হৃদয়ে তাহার।"

ভদ্রা সোহাগভরে ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আহা ! সে চুম্বনে কত স্নেহ ! কি শীতল সুধাধারা সেই চুম্বনের মধ্য দিয়া দুইটী প্রাণে বহিয়া গেল !

শৈলের আজ কি স্বর্গসুখ ! চুম্বনের এ প্লাবন রুদ্ধ করিয়া—পবিত্রতার এ মন্দাকিনী-প্রবাহ ত্যাগ করিয়া সে আজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আর কি বলিবে—কি জানাইতে চাহিবে ? সে শুধু নীরবে সাশ্রুনয়নে ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রা আত্মহারা ভাবে আবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তার পর তাহাকে বুকে আঁটিয়া লইয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—

"শৈল ! শৈল ! বল্ দিদি ! থাকিবি এরূপে—
থাকিবি আমার বুকে, ছাড়ি আমাদেরে
আর যাইবি না— আমি দিব না যাইতে।
* * * * * *
চতুর্দ্দশবর্ষ আজি প্রতিমারে তোর
পূজিয়াছি নিরন্তর হৃদয়ে দুজনে।

স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত
কত স্বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত।

* * * * * *

বেড়াইয়া বনে বনে হায়! বাণবিদ্ধ
বনকুরঙ্গিণী মত, কি দুঃখ দারুণ
না জানি সহিলি বোন! আয় বুকে আয়,
ভদ্রার্জ্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেমধারা
যুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন; তব পিতৃভুমি
সমুদ্ধৃত; পিতৃপুরী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমান, পার্থের আদেশে
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পিচূড়ামণি।
তব মরকতমূর্ত্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পুরীতে; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ-তুষানল কর্ নির্ব্বাপিত
অর্জ্জুনের সুভদ্রার! এই যুদ্ধশেষে
কিম্বা চল্ ইন্দ্রপ্রস্থে, চল্ প্রেমময়
অর্জ্জুনের বুকে, এই বুকে সুভদ্রার।"

আবার দুইজন কত কাঁদিল। ভদ্রা শোকভরে কাঁদিলেন—শৈল সুখের আনন্দে কাঁদিল। তার পর সুভদ্রার বক্ষঃস্বর্গ হইতে মুখ তুলিয়া সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"—————দিদি! তোমাদের—
চরণযুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার!
সফল তপস্যা তার; কিন্তু কহ, হায়!
কেবল কি বনে দুঃখ, গৃহে দিদি! সুখ—
এই কুরুক্ষেত্র হায়! প্রাঙ্গনে যাহার।"

কি কঠোর প্রশ্ন? ভদ্রার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল! শৈলজার মুখমণ্ডলে কেন যে শান্তির পবিত্র আভা নিত্য প্রতিফলিত, তাহা তিনি সহজে বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল—কোমলতার মূর্ত্তি শৈলের হৃদয় পীড়িত, নিঃসহায় অনার্য্যগণের ব্যাথায় উচ্ছ্বসিত! প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ প্রেমের সাধনায় যেন ধীরে ধীরে আপনাকে বিশ্বদেবতার চরণতলে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল! শৈল দেখিল—ভদ্রার মুখে সহসা কি যেন অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া আসিয়া পড়িল—তাঁহার বিস্তৃত নয়ন অলৌকিক প্রতি-ভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তিনি তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া শৈল আনন্দে নতমুখে উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া রহিল। ভদ্রা কহিলেন—

"শৈলজে! সুখের তরে আকুল জগত;
সুখ-অন্বেষণ—স্থিতি, গতি, জগতের।
* * * * * * অজস্রধারায়
ঝরে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিকায়,
গরজে জীমুতমন্দ্রে, বর্ষে বরিষায়,
গায় কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
মলয়ের সমীরণে, ফলে তরুদলে,
ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে!
সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্ব্বময়;
কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
করিতেছে হাহাকার। মানুষের সুখ
নহে গৃহে, নহে বনে, বুঝে নাই হায়!
নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্যায়।"

শৈল প্রশ্ন করিল—

"বল দেবি ! কিসে তবে সুখ মানুষের ?"

সুভদ্রা । "জগত অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
একতানে—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে সুখ, পুষ্পত্বে পুষ্পের ;
মনুষ্যত্বে তবে বোন্ ! সুখ মানুষের।"

শৈল । "কারে বল মনুষ্যত্ব ?

সুভদ্রা । "চরিতার্থতায়
বিহঙ্গবৃত্তির, বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের।
মানুষ কি নিয়া বল মানুষ ভগিনী ?
আত্মা মন, কলেবর। চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব।

* * *

স্বধর্ম্ম পালনে,
স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়
যতই মানুষ ক্রমে হয় অগ্রসর,
লভে তত মনুষ্যত্ব, সুখ নিরমল।
পূর্ণ মনুষ্যত্ব—দুঃখ-মুক্তি, নিরবাণ,
বৈকুণ্ঠ পরমসুখ, স্বর্গ ভগবান !"

শৈল । "ইহা কি বৈদিক ধর্ম্ম ?"

সুভদ্রা । "বেদ-ধর্ম্ম শৈল !
এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান।"

শৈল । "এই মনুষ্যত্ব—এই স্বধর্ম্ম সাধন
হয় না কি বনে দেবি !"

সুভদ্রা । "ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর

এ ধর্ম্মের গৃহ দিদি ! এ মহাধর্ম্মের
ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত।”

শৈল বুঝিল। তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল ! অনার্য্যা রমণী সৌভাগ্যবশে ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া সাধনার যে বীজ লাভ করিয়াছিল—আজ সুভদ্রার শিক্ষারসে তাহাকে অঙ্কুরিত ও সঞ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরের অন্তরে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল।

সে কাতর কণ্ঠে কহিল—

‘‘চল তবে দিদি ! হায় ! ধরাতলে
এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর ?
সাধিবারে লোকহিত ! এ ভারতভূমি
যাহাদের পিতৃভূমি, সে অনার্য্যজাতি
আজি কোথা. দেখ আহা ! কি দশা তাদের !
রাজ্যহীন, গৃহহীন, আহারবিহীন,
আজি তারা বনে, আজি পশু নির্ব্বিশেষ !
সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, সুখে আজি আর্য্যগণ
দেবোপম ; হায় ! দেবি ! আছে তাহাদের
কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
সাধিতে অজস্র হিত ; আছে তাহাদের
পার্থ ভুজাশ্রয়, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়,
সুখদাতা, পরিত্রাতা নর-নারায়ণ ;
হইয়াছে সূর্য্যোদয়ে আবির্ভাবে তাঁর
সমুজ্জ্বল আর্য্যভূমি, অমাবস্যা ঘোর
অনার্য্যের হায় ! দিদি ! রবে কি এমন ?
পতিতপাবন হরি !—এ পতিত জাতি
পাবে না তাঁহার দয়া ? পাবেনা তোমার ?

কি কাতর কণ্ঠ! কি সকরুণ মিনতি! ভদ্রা বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাবে শৈলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন! সহসা কি যেন কি মেঘ তাঁহার নয়ন হইতে সরিয়া গেল—তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিসহকারে দেখিলেন, শৈলজা—

"————————ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী
অনার্য্যের; বিলাইয়া হরিনাম সুধা
বাঁচাবে অনার্য্য জাতি। ধর্ম্ম বিনা আর
হইবে না কোন মতে অনার্য্য উদ্ধার।"

তাঁহার দুই নয়নে যুগল শীতলধারা বহিতে লাগিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কিয়ৎপরে কৌতূহলবশে কহিলেন—

"——————শৈল! শৈল! এ চৌদ্দ বছর—
কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীরে
কহ দয়া করি।"

শৈল ঈষৎ হাসিল। সে হাসি বর্ষার জ্যোৎস্নার ন্যায় সজল নয়নের হাসি! ম্লানমুখে, নতনেত্রে সুভদ্রার অংসে বদন রাখিয়া সে কহিল—

"বড় সুখে ছিল দিদি! শৈলজা তোমার।"

তার পর ধীরে ধীরে আনুপূর্ব্বিক স্বীয় জীবনের অপূর্ব্ব মধুর কাহিনী বলিয়া গেল। সেই চিরনবীন অদ্ভুত কাহিনী আমরা ইতি-পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জানাইয়া রাখিয়াছি।

ভদ্রা এই পুণ্যবতী রমণীর কঠোর আত্মবিসর্জ্জন, পবিত্র স্বার্থত্যাগ, ও অলৌকিক সংযমের কাহিনী সবিশেষ শুনিলেন। বিস্ময়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল! শৈল বিহ্বলভাবে তাহার কাহিনী শেষ করিয়া যখন ভদ্রার চরণে আশ্রয় মাগিয়া কহিল—

"দেও স্থান দেবি! আজি চরণে তোমার।"

তখন ভদ্রা দ্রুতবেগে সেই বিহ্বলা বালায় বক্ষে লইয়া কহিলেন—

"শৈল! শৈল! পুণ্যবতী! পদতীর্থ তোর
সুভদ্রার যোগ্যস্থান।

* * * * * *

আয় দিদি! আয়!
দুইজনে গৃহে, বনে, গাব কৃষ্ণ নাম।
এইরূপে দুইজনে প্রেম-আলিঙ্গনে
বাঁধিব অনার্য্য, আর্য্য। গাহিবে জগত
কৃষ্ণনাম; কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিবে ধরণী।
কুরুক্ষেত্র-ঐরাবত ভাসাইয়া বেগে
ছুটিতেছে প্রেম-গঙ্গা পতিতপাবনী—
আর্য্যভূমি, বনভূমি, করিতে উদ্ধার।"

শৈল তখন অশ্রুজলে ভদ্রার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছিল। তাহার উদাস নয়নের স্থির দৃষ্টি যেন দূরে, অতি ঊর্দ্ধে, নীলমণিময় পটে কাহার চরণপ্রান্তে আবদ্ধ ছিল! সে কিছুই উত্তর করিল না। ভদ্রা সোহাগভরে তাহাকে ডাকিতে সে সহসা পাগলিনীর ন্যায় কিয়ৎদূর ছুটিয়া গিয়া কহিল—

"——————ওই দেখ! ওই দেখ দিদি!
* * * * বসি চন্দ্রাসনে
জনক জননী মম কি প্রীতি বদনে!
প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ? মাতা!
কে মাতা?—সুভদ্রা!"

শৈল ত্রস্তপদে ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রার বুকে পড়িয়া আবেগভরে শুধু কহিল—

"————————ওমা ! মা ! আমার
মাতৃহীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃহীনা,
নারায়ণ ! এতদিনে পাইল জননী।
পতিতপাবনী মাত ! পতিতা কন্যায়
রাখিস্ চরণে তোর !"——

আর বলিতে পারিল না—সে সুভদ্রার অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল। কি-যেন-কি ভাবের আবেগ আসিয়া তাহার সংজ্ঞা অপহরণ করিল।

নীরব রজনী। সুভদ্রার অঙ্কে সিক্ত নীলাম্বুজ সম শান্ত সমুজ্জ্বল শৈলের মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া চন্দ্রদেব যেন আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। ভদ্রাদেবী আনন্দে আত্মহারা! তাঁহার সুচারু গণ্ডস্থল বহিয়া আনন্দের পবিত্র ধারা দরদর বহিতে লাগিল। নিশার তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে নব হেমন্তের সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শে শৈলের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। শৈল ভদ্রার উরসে মুখ লুকাইয়া কহিল—

"————রজনী দেবি ! অবসান প্রায়।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মতন
ভাসিতেছে সুখ-তারা ; অনন্ত আকাশে
মানবেরো দুঃখ-নিশি হতেছে প্রভাত।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাম্বুজে, কর এ প্রতিজ্ঞা—
কালি রণে পুত্রে তব দিবেনা যাইতে ;
রাখিবে বাঁধিয়া মত্ত করি-সুত মত
সুদৃঢ়, স্বর্গীয়, মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে।"

শৈলের কাতর অনুরোধ সুভদ্রার প্রাণ স্পর্শ করিল ; কিন্তু তিনি এই অন্যায় অনুরোধের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন শৈল ?"

শৈল। "শুনিয়াছি কৌরব-মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীর-ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের ; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জ্জয় গাণ্ডীব-বল।"

সুভদ্রা। "অন্ধের সন্তান,
হতভাগ্য কৌরবেরা, অন্ধ চিরদিন।
বুঝে নাহি হায় ! তারা গাণ্ডীবের বল,
নহে শিশু অভিমন্যু, গাণ্ডীবের বল
জনার্দ্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ।
ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন
জান শৈল। ধর্ম্ম-যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী—অভিমন্যুর জননী—
হইবে পতিতা আহা ! কৃষ্ণের ভগিনী ?"

শৈল এই ধর্ম্মযুদ্ধমূলক যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিল না ; সে কৌতূহলবশে প্রশ্ন করিল—

"ষোড়শবর্ষীয় শিশু করিবে সমর
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ?"

সুভদ্রা। "ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কেশরী-শিশুর।
ষোড়শবর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি। ষোড়শবর্ষীয়

পুত্র মম মহারথী। ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধনুর্ব্বাণ অঙ্গের ভূষণ !
পিতা করুণার সিন্ধু, পুত্র করুণার
নব ঘন ; শ্লথ করে করিতেছে রণ !
কৃষ্ণ-সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার স্রোতে। অন্যায় সমরে
করে অন্ধ কৌরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হবে কুরুকুল।"

সুভদ্রার আশ্বাসবাণীতে শৈলের প্রাণ প্রবোধ মানিল না। তাহার কোমল প্রাণ কুমারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে রুদ্ধশ্বাসে কেবল মাত্র কহিল—

"নরহরি! নারায়ণ! বিপদভঞ্জন।
রক্ষিও বাছায় তবে। বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বনমাতার তাহার
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ ; হইবে উদয়
অরুণ উষার সহ, আশ্রমে আমার—
আঁধার হৃদয়ে মম। অনাথিনী-নাথ!
এই চির-অনাথিনী চাহে নাহি আর—
চাহিবেনা—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটা বাসনা কর পূরণ তাহার।"

শৈলের নয়ন বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। চির-অনাথিনীর ক্ষুদ্র প্রাণের অতুল, অপরিমেয় স্নেহের পরিচয় লাভ করিয়া ভদ্রার সংযত হৃদয় গলিয়া গেল। শৈলজার এই নৈশ অভিযান কেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। সাশ্রুনয়নে শৈলের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—

—অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
বরষিতে স্নেহ-সুধা জনম কি তোর
ধন্যভাগিনি! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বুকে।"

শৈল সাশ্রুমুখে ধীরে ধীরে কহিল—

"একটি হিল্লোলে আমি আকুল যাহার,
বহিছে সে স্নেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার,
শান্তিময়ী, সুধাময়ী! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন! বুঝিলাম হায়!
এতদিনে কি কঠিন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
বুঝিলাম এতদিনে, লক্ষ্মী অনার্য্যের
কেন আর্য্যপদানতা। বুঝিলাম আর
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার।"

সুভদ্রা ধীরগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—

"বড়ই কঠিন ধর্ম্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নর।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশ্বেশ্বর।"

তার পর শৈলজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে বসুন্ধরা পাপে পরিপূর্ণ বলিয়াই মানবসমাজ দুঃখপারাবারে পরিণত হইয়াছে। দুঃখ বিধাতার নির্ম্মম লিপি নহে। জগৎ আনন্দ-রাজ্য—সুখের প্রস্রবণ! মানব নিয়তির পথভ্রষ্ট বলিয়া—অধর্ম্মের সৃজন করে বলিয়াই তাহার অদৃষ্টে এই গভীর দুঃখ। মানবের এই অধর্ম্ম নাশ করিতে কুরুক্ষেত্র সমরের উদ্ভব। এই মহাসমরে সুভদ্রা পতি, পুত্র এমন কি আত্মসমর্পণ করিলেও যদি ধরাতলে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়—যদি মানবের সুখ-পথ চিরতরে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মত ধরাতলে পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী আর কে আছে?

শৈল ম্লানমুখে, নিবিষ্টচিত্তে সকল কথা শুনিল। ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া দেখিল জগতমাতার যুগল কপোল বহিয়া মাতৃপ্রেমবিগলিত, সন্তাপহারিণী, যুগল-ধারা দর দর ধারে বহিতেছে! সে উচ্ছ্বাসভরে কহিল—

"পিতৃগণ! দেবগণ! কে আছ কোথায়
দেখ পুণ্যবতীর এ আত্মবিসর্জ্জন
মানব উদ্ধার ব্রতে! এ পুণ্যে মাতার,
করিয়া শৈলের স্নেহে কবচ নির্ম্মাণ,
সমরে করিও রক্ষা বাছারে আমার।"

তার পরে নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া ভদ্রার চরণে বিদায় প্রার্থনা করিল। ভদ্রা সস্নেহে তাহার কর ধরিয়া কহিলেন—

"থাক্ মুহূর্ত্তেক শৈল। মধ্যম পাণ্ডবে
ডেকে আনি, ডেকে আনি নর নারায়ণে—
আমার তোমার দেব উপাস্য যুগল!
পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
দুইজনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়
করিতে তুলনা তার। ভগিনীর তোর
রক্ষা কর অনুরোধ; এক দিন আর
থাক্ বুকে, লয়ে বুকে অভি-উত্তরায়।"

শৈল নীরবে সেই প্রেমপূর্ণ বুকে মস্তক রাখিয়া অনিমেষ-নয়নে ভদ্রার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নীরব নিস্পন্দ দৃষ্টি—ভাবহীন অথচ অনন্তভাবপূর্ণ দৃষ্টি—শিশিরমথিত কমলদলের ন্যায় অশ্রুভারাপ্লুত মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া ভদ্রার অন্তর গলিয়া গেল। তিনি শৈলকে সোহাগভরে বুকে টানিয়া লইলেন। শৈল মধুরকণ্ঠে কহিল—

"না দিদি!——————————
* * * * * হয়নি এখনো
শৈলজার সে যোগ্যতা—সিদ্ধি তপস্যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনপদতীর্থ করিবে দর্শন।
আজিও কাঁপিল বুঝি হৃদয় আমার
নিরখি পার্থের মুখ! * * * *
* * * * পারিবে যেদিন
নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
দেখিতে পার্থের মুখ, করিতে দর্শন
নারায়ণ পদাম্বুজ শান্তিনিকেতন—
পারিব যেদিন মিলি ভগিনী দুজনে,
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার,
সে মহাপ্রয়াগ তীর্থ—দেখিব যেদিন
আর্য্য অনার্য্যের শক্তি, সুভদ্রা শৈলজা,
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগলা—
সেদিন আসিবে শৈল চরণে তোমার।"

কিন্তু যতদিন না তাহার এই স্বপ্ন সার্থক হয়, যতদিন না রমণীর সেই উচ্চ ধর্ম্ম সাধনে সে সফলকাম হয়—যতদিন না নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় তাহার হৃদয়কে সে সংযত করিতে ও স্ববশে আনিতে পারে, ততদিন কৃষ্ণার্জ্জুনপদতীর্থদর্শনরূপ এই কঠোর প্রলোভন—এই ভীষণ হৃদয়সংযমমূলক অগ্নি-পরীক্ষা হইতে সে আপনাকে দূরে রাখিবে। ততদিন—

"গৃহক্ষেত্র সুভদ্রার, শৈলজার বন!"

শৈল ধীরে ধীরে আকাশের পানে চাহিয়া এই কথাগুলি বলিয়া নীরব হইল। সুভদ্রা নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—

"চন্দ্রদীপ্ত, অশ্রুসিক্ত কপোল-কমলে
বহিছে সে প্রেমধারা !"

কবি দেখিলেন—

"* * * * সিত চন্দ্রালোকে
হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে—স্বপ্নে মহিমার,
মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত ;
অপার্থিব, প্রেমময়, পবিত্রতাময় !"

কবির এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। সেদিনের সেই বিরহিনী উপেক্ষিতা অনার্য্যা রমণী আজ বিশ্বপ্রেমের মাধুরী উপলব্ধি করিয়া যে ভদ্রাদেবীর ন্যায় মানব-উদ্ধার-ব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিতেছে, ইহা ভাবিলে কবি-কল্পনা যে এত উচ্চে উঠিতে পারে তাহা অবশ্য প্রথমটা মনে আনিতে পারি না বটে ; কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি যে উদারতা, প্রেমপরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতা ও বিশ্বহিতৈষণার একত্র সমাবেশ রমণীহৃদয়েই সম্ভব—যখন মনে পড়ে নির্ব্বাসিতা সীতা বা উপেক্ষিতা দময়ন্তী, অথবা পতিপ্রাণা সাবিত্রী বা মহিয়সী শৈব্যা—যখন দেখিতে পাই গৃহচর্য্যায়, পরিজনসেবায়, পতিপ্রাণতায়, সমবেদনায়, আত্মত্যাগে ও সংযম-সাধনায় ভারতের রমণী কুসুমের ন্যায় কোমলতাময়ী, অথচ কুলিশের ন্যায় কঠোর-প্রকৃতিসম্পন্না—তাঁহাদের হৃদয় বড় উন্নত, বড় কোমল, বড় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বড় ভক্তি-প্রবণ—তখন কবিকল্পনাপ্রসূত এই চিত্রখানি যে সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ-নিরবদ্য হইয়াছে তাহা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। তখন সত্যই

যে দেশের সাহিত্যে কুন্তী ও দ্রৌপদীর, শকুন্তলা বা মালবিকার, ঔশীনরী বা কপালকুণ্ডলার, ভাগীরথী বা লোপমুদ্রার চিত্র বর্ত্তমান, সে দেশের সাহিত্যে সুভদ্রার পার্শ্বে শৈলজার স্থান দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং আমরা কবির আদর্শ সৃষ্টিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেই সাহিত্যেরই সেবক বলিয়া মনে মনে একটা অখণ্ড গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

সে যাহা হউক দেখিতে দেখিতে শৈলের নয়নযুগল বিস্তৃত হইল; সে উন্মাদিনীর মত দুই বাহু বাড়াইয়া আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—

"ওই দেখ! ওই দেখ! জনক-জননী
আবার বসিয়া ওই শশাঙ্কমণ্ডলে!
কি হাসি বদনে, আহা! কি প্রেম নয়নে!
সফল হইবে স্বপ্ন। একি দেখি পুনঃ
হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর
কি মূর্ত্তি ভাসিল ওই—সুভদ্রা অর্জ্জুন!
পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার!
পিত! পিত! মুছে ফেলে শোক হৃদয়ের।
ওই দেখ শৈল আজি দুহিতা তোমার।
সফল তপস্যা; দেখ হৃদয় তাহার
পিতৃপ্রেমে অবিচল, স্থির অকম্পিত।
মা আমার! মা আমার! প্রেমমুখ তোর
কি সুন্দর! কি ত্রিদিব! কি দেখি আবার!
এক সঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
কি মূর্ত্তি মহিমাময় নীলমণিময়
উঠিল ভাসিয়া শতচন্দ্রকরোজ্জ্বল!
বাসুদেব! নারায়ণ।————"

শৈলের মুখে আর কথা সরিল না। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে ধীরে ধীরে আসিয়া নীরব, নিদ্রিত কুরুক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শৈল ও সুভদ্রা উভয়ে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার শ্রীচরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির, অবিচলভাবে অপূর্ব্ব মহিমার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া স্বয়ং নারায়ণও যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন!

কি স্বর্গীয় চিত্র! কি সুন্দর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি! কি সূক্ষ্ম কৌশলে কবি শৈলজার এই চিত্র দর্শন অঙ্কিত করিয়াছেন! শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা, অনাথিনী শৈলজা পূর্ণমাত্রায় যদি কাহারও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে, তবে সে তাহার স্বর্গগত পিতা ও স্বর্গগতা জননীর। শৈলের অদৃষ্টে তেমন স্নেহ ও সোহাগ জীবনে আর কখনও পূর্ণরূপে লাভ করিবার অবসর জুটিয়া উঠে নাই। কৈশোর তাহাকে স্বপ্রকৃতিবশে ভ্রাতা ও ভগিনীর সংসার হইতে এক অপূর্ব্ব প্রেরণায় বিচ্যুত করিয়াছিল। তার পর যৌবনের প্রথম সঞ্চার হইতে সে চিরদিন নিরাশার তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া আসিয়াছে। প্রেমের স্বপ্ন সে অনেক দেখিয়াছিল; কিন্তু সে স্বপ্নের সফলতা তাহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই! যৌবন-মধ্যাহ্নে মহর্ষির কৃপাকণা লাভ করিয়া যোগিনী সাধনার পথে যেটুকু শক্তিলাভ করিয়াছিল—পার্থনন্দন অভিমন্যুর দর্শন লাভ করিয়া যোগিনীর হৃদয়ে স্বীয় ব্রত উদ্যাপনের লালসায় যে সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল—আজ সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই শক্তিপ্রনোদিত হইয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে সুভদ্রা-শিবিরে আসিয়াছিল। সৌভাগ্যবশে, সুভদ্রার শিক্ষাগুণে তাহার সরস, উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে যে বীজ নিহিত ছিল, তাহা নিমেষের মধ্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিল। অনাথিনী রমণী ভদ্রার পবিত্র মাতৃস্নেহপূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া, তাহার বহুদিনের বাঞ্ছিত

মাতৃসঙ্গসুখের আশা পূর্ণ করিয়া, আর্য্যলক্ষ্মী পবিত্রতাস্বরূপিনী ভদ্রাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিল। ফলতঃ এই উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধির বলেই পার্থের প্রতি তাহার হৃদয়জাত সঙ্কীর্ণ প্রেমের অনুমাত্র ছায়াও তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না ; এবং সে এক অনাবিল পবিত্র প্রেমসম্পর্কে পার্থের সহিত জড়িত হইল ! শৈলের এই আত্মোন্নতি দর্শনে সম্ভবতঃ তাহার পিতামাতা উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে দেখা দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। শৈল যে তাঁহাদের প্রদর্শিত কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হয় নাই বরং সেই পবিত্র পথে চলিয়া সংযমশক্তিবলে অনার্য্য-ধর্ম্মের রাণী হইয়া পতিত জাতির উদ্ধার-কল্পে ব্রতী হইয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের উৎফুল্ল হইবার কথা। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদফলে শৈল, সুভদ্রা ও অর্জ্জুনকে আকাশপটে মাতাপিতারূপে অঙ্কিত দেখিল। তার পর সাধনার বলে, উপাসিকা মূর্ত্তিতে ভক্তভাবে "দুহুঁ অঙ্গ এক করিয়া" সে যাহা দেখিল, সে অনুপম দেববাঞ্ছিত মূর্ত্তি, সকল সাধনার চরম লক্ষ্য—সকল ধারণা ও উপাসনার শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু। ভক্ত, বৈষ্ণবকবি শৈলজাকে তাহার সেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য দেখাইতে গিয়া সাধনার কৌশল কেমন সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ভক্তিভরে ও বিস্ময়ে আমাদের উদ্ধত শির সাধক কবির চরণে স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। ভক্ত কবি তাঁহার ইষ্টদেব, সেই নীরদবরণ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তলে ভদ্রা-শৈলজার মূর্চ্ছিতাবস্থায় যে সকরুণ প্রার্থনা-গীতি গাহিয়া-ছেন, আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিলাম। ভরসা করি, কবির এই প্রার্থনা-গীতিও কেমন পতিতোদ্ধারকামনামূলক, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন এবং কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবেন——

"দাঁড়াইয়া থাক, নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি,
আর্য্য-অনার্য্যের লক্ষ্মী !
থাক মা চরণে পড়ি।
অনার্য্য-আর্য্য শক্তির
এইরূপ সঙ্ঘর্ষণ—
ভারত নিয়তি যদি,
তব ইচ্ছা নারায়ণ !
এইরূপে পদতলে
হয়ে শেষে সম্মিলিত,
উদ্ধারি পতিত নাথ !
হয় যেন প্রবাহিত।
থাক দাঁড়াইয়া, নাথ !
নিরখি নয়ন ভরি,
আর্য্য-অনার্য্যের লক্ষ্মী !
থাক মা চরণে পড়ি।"

* * *

ইহার পরে কবি শোকক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরবালক অভিমন্যুর শরশয্যা পার্শ্বে শৈলজাকে আনিয়াছেন। কবির নিপুণ তুলিকাপাতে হৃদয়দ্রবকারী এই শোকচিত্র কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা রসপিপাসু পাঠককে "কুরুক্ষেত্র" পাঠে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। কবি শোকমথিত হৃদয়ে এই করুণ দৃশ্য যেরূপ জীবন্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন, বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে সেরূপ আদর্শ অঙ্কণ-নৈপুণ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন্ ঘটনায় কেমন করিয়া শোকের সংঘাত অনুভূত হয়, স্মৃতির প্রবল উত্তেজনায় শোকা-

নল বাড়বানলের ন্যায় কেমন অন্তর-অন্তর দলিত মথিত করিয়া দেয়, মানবহৃদয়বীণার অতি কোমল পরদাগুলি শোকের সেই কঠিন অঙ্গুলিপরশে অলক্ষিতে কেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়—তাহা ধারণা করিতে হইলে কবির এই শোকচিত্র হৃদযঙ্গম করুন; বুঝিবেন, কবি-কল্পনায় যে মহাশোকের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনের দৈনন্দিন শোক-ব্যাপার হইতে অনুমাত্র ভিন্ন নহে; বরং অনেক স্থলেই তাহা এত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, যে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী অজ্ঞাতে আপনহারা হইয়া কবির বীণার সুরে সুর মিলাইয়া আপনিই বাজিয়া উঠে! হৃতবৎস শার্দ্দুলের ন্যায় অর্জ্জুনের শোককাতর হৃদয়ের অবস্থা—উন্মাদিনী বালবিধবা উত্তরার মর্ম্মন্তুদ বিলাপগীতি—বীর-জননী ভদ্রাদেবীর কঠোর আত্মসংযম-চিত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বীরকুমার অভিমন্যুর মহিমাময় আত্মদান-কাহিনী—সর্ব্বোপরি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সেই অতুলনীয়, শান্তিপ্রদ উপদেশামৃত ভাষায় পরিস্ফুট করিতে গিয়া কবি যে অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। বাস্তবিকই বঙ্গ-সাহিত্যে 'কুরুক্ষেত্রের' ন্যায় অন্য কোনও কাব্যে লাবণ্যময়ী কবিতার সঙ্গে এরূপ উচ্চাঙ্গের মনোরম দার্শনিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

দিবা অবসানপ্রায়। ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়াক্ষেত্র "কুরুক্ষেত্র" বিকৃত মানব-শবে সমাকীর্ণ। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু হস্তহীন, পদহীন, ছিন্নশীর্ষ, গলিত শবরাশি—শুধু রক্তস্রোত, যেন প্রলয়ের তাণ্ডব নর্ত্তন! ক্রোশান্তর ব্যাপিয়া ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে, সমরক্ষেত্র আচ্ছন্ন। সায়াহ্ন গগন আহতের আর্ত্তনাদে—ক্ষত গজ-তুরঙ্গের ভীষণ চীৎকারে—হিংস্র পশুপক্ষীদের ঘোর কোলাহলে মুখরিত। কোথায় কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটিয়া আকাশের পানে চাহিয়া

চির-নিদ্রায় আচ্ছন্ন—তাহার নয়ন ঘূর্ণিত—কর মুষ্টিবদ্ধ! কোথায় কাহার অস্ত্রক্ষত হইতে এখনও ঝলকে ঝলকে শোণিতস্রাব হইতেছে—যোদ্ধা শোণিত-কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া ম্লানমুখে ভূতল চুম্বন করিয়াছেন! তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রবিদ্ধ। কোথায় কোন আহত যোদ্ধা ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া কাতরকণ্ঠে হাহাকারে গগন পূর্ণ করিতেছে—শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল ও কুকুর আসিয়া কখন কখনও তাহাকে জীবন্মৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিতেছে! কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় স্থানে স্থানে আহতের ক্ষতে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন; মুমুর্ষুর প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিতেছেন! সমগ্র সমরপ্রাঙ্গন শোকস্তম্ভিত! আর—

"কেন্দ্র স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইছেন সুখে। * * *
মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত!
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে
আদর্শ বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা।"

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই দুঃসহ শোকের প্রবল আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শোকাপ্লুত কণ্ঠে কহিলেন—

"* * * * হা পুত্র আমার!
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু পুরী,
মৃত্যু পুরী স্বর্গ আজি লভিয়া তোমায়!

জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্ব্বাহ্নে অস্ত! কবিতা-জোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিভিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সঙ্গীতের বীণা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে?
প্রকৃতির অতুলিত তুলি বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে?

* * * *

উঠ বৎস! উঠ! না না—নাহি মৃত্যু তোর;
দেবী-পুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের;
দেব-শিশু তুই ওরে করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব, তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। * *
'নিজে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর মৃত্যুঞ্জয় হরি,
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটেরে তোর।"

শোকোন্মত্ত পার্থের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া রহিলেন; সুপবিত্র জ্ঞান-বক্ষ পাতিয়া অর্জ্জুনের সেই দুঃসহ শোকাবেগ যেন ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন শুনিলেন নরনারায়ণ গদগদকণ্ঠে কহিতেছেন—

"এই বিশ্ব লীলাভূমি বিশ্ব নিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।

জ্বলিছে নিভিছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য্য গৃহস্থের ;
আলোক প্রদান পার্থ ! নিয়তি দীপের
আমি নর—ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী—নারায়ণ।
আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার ;
জন্মিতেছি, মরিতেছি, নিয়তি আমার
পালিতেছি এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে
নারায়ণ লীলাভূমে ; ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহালীলা যন্ত্রে ; নিয়তি পালন
সুখ মম, ঘোর শোক—নিয়তি লঙ্ঘন।

* * * * *

কর শোক পরিহার ; করি অনুসার
চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে !"

উচ্ছ্বাসকম্পিত কণ্ঠে ভদ্রাকে কহিলেন :—

"সুভদ্রে ! * * * নাহি আমাদের শোক,
গাও প্রেমপূর্ণ স্বরে মানব মঙ্গল।
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
কোন জননীর পুত্র লভেছে কখন ?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সফল জীবন ব্রত, অধর্ম্ম হয়েছে হত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাইছে মানব জাতি কি মঙ্গল গীত।"

সুভদ্রা শুনিল। যে কর্ণে শত শত শঙ্খের গর্জ্জন প্রবেশ করে নাই, আজ সেই কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদু সম্ভাষণ প্রবেশ লাভ করিল! স্নেহময়ী জননীর নয়নপ্রান্ত বহিয়া ভক্তির আবেগে যেন দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। করুণাস্বরূপিনী বিশ্বজননীর হৃদয়তন্ত্রী যেন সেই মৃদু সম্ভাষণে বাজিয়া উঠিল। ভদ্রাদেবী কহিলেন—

"দয়াময়! নাহি শোক; সাধিল তোমার কর্ম্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।

* * * *

ক্ষুদ্র লতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল,
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল;
তব পদাশ্রিতা লতা, পুণ্যবতী ভদ্রা তথা,
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব মঙ্গল—
লতার ত এই সুখ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
মাতৃপ্রেমে; পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার?
সমগ্র মানব জাতি, আজি অভিমন্যু মম
আজি অভিমন্যু মম, বিশ্ব চরাচর;
এক মর পুত্র মম হারাইয়া লভিয়াছি
আজি কি মহান পুত্র—অনন্ত, অমর!
বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ,
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার।
অনন্ত, অমর পুত্রে, আনন্দে লইয়া বুকে,
এইরূপে শিখাইব নাম নিরমল;

কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানব মঙ্গল।"

শ্রীকৃষ্ণ নীরব নিশ্চল ভাবে সুভদ্রাদেবীর এই উক্তি শুনিলেন। শান্ত স্থির বিস্ফারিত নেত্রে শান্তিপূর্ণ আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। অর্জ্জুনের শোকঝটিকাবিক্ষুব্ধ হৃদয়েতে ধীরে ধীরে যেন শান্তির অনিল সঞ্চার হইল। অর্জ্জুন দূর শূন্য পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিলেন, যেন তাঁহার পুত্রমুখ অনন্ত অমর আকারে বিরাজিত! তাঁহার হৃদয়ে কি এক নবীন প্রীতির নির্ঝর উথলিয়া উঠিল।

সেই মহান সুপবিত্র শোকতীর্থে—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—শান্তি-স্বরূপিনী শিষ্যা শৈলজা সহ শান্তমূর্ত্তি মহর্ষি ব্যাসদেব সেই সময় উপনীত হইলেন। উভয়ের ঊর্দ্ধনেত্র; উভয়ের বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত; সুপবিত্র হরিনামগানে উভয়েই আত্মবিহ্বল—উভয়ের নয়ন প্রেমাশ্রুবিগলিত! শোকস্তম্ভিত, অশান্ত কুরুক্ষেত্র যেন ক্ষণকাল নিস্পন্দ ভাবে শান্ত হৃদয়ে সেই শান্তিমাখা সঙ্গীত-সুধা পান করিল। মহর্ষি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ধনঞ্জয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন—

"ধনঞ্জয়! শোক তব কর পরিহার!
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব নিয়ন্তার।

* * * * *

ছিল কত শত বীর আজি নাহি আর
কত শত নব জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিবা মহাকালের হুঙ্কার
উঠিছে, পশ্চাতে আর সম্মুখে তোমার!
কালের তরঙ্গ যদি দেয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হতে মানবের নাম,

সর্ব্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান—
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া,
অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া।
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন, গড়িছে নূতন ;
জগতের নীতি এই মহা-বিবর্ত্তন।
এই বিবর্ত্তন-গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর
কেমনে রহিব স্থির হইয়া অমর ?
পুত্র যাবে, পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার
এই বিবর্ত্তনে, শোক কর পরিহার।
* * * * এই বিবর্ত্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব নয়নে,
ফুটে তথা সুখ-হাসি মানব বদনে ;
কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি—
সকলি তাঁহার ইচ্ছা ; এই আমি জানি,
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্ত্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার ;
আমি মরি, মরে পুত্র, শোক কি আবার ?
মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব,
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ ! মিশাইয়া জলে,
একে ভাটা, অন্যদিকে জোয়ার উছলে।
* * * *
নরশোকে পুত্রশোক করি নিমজ্জিত,
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,

তব বীরপুত্র মত হও অগ্রসর
মানব-উন্নতি-পথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি।

* * * *

চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল ;
আনন্দে গাইয়া হরে মুরারে কেবল।"

উদাসিনী, গৈরিকবসনা শৈলজা এতক্ষণ স্থির উর্দ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মহারা ভাবে মহর্ষির এই সুধামাখা উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেছিল। সহসা সেই ভীষণ শোকদৃশ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। যোগিনী শোকোদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে কুমারের শিরোদেশে বসিয়া দুই বিন্দু শোকাশ্রু বর্ষণ করিল। তারপর নীরবে উঠিয়া গিয়া পার্থপদতলে পড়িয়া কহিল—

চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তাহার।"

পার্থ উচ্ছ্বাসভরে উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। পার্থবক্ষে সেই নীলাব্জ প্রতিমাখানি যেন শান্ত সুনীল আকাশে সন্ধ্যার নীলিমার ন্যায় শোভা পাইল। পার্থ ডাকিলেন—

"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—

কিন্তু হায়! সেই শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস ছুটিল, তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে যে ভাষা নাই—তাহা যে ভাল করিয়া বোঝাইবার উপায় নাই! পার্থ চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অচলভাবে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শৈলজা পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের পদতলে পড়িয়া কহিল—

"অজ্ঞানী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া যথা

নারায়ণ রূপ, পূজা করি দেবতায়
হয় পূর্ণমনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
দেখে শান্তিসুধাপূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত-অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর—
তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন,
পূজি নর, পাইয়াছি নর নারায়ণ।
পতিতপাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজি পুত্র পুণ্যবান, দিয়া আত্ম বলিদান
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দ্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ!
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার;
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া, মুছাইল সেই ছায়া
পতি, পিতা, পুত্র তুমি আজি শৈলজার;
পুণ্যবতী—আজি পূর্ণ তপস্যা তাহার।"

পুণ্যবতীর তপস্যা সফল হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের ব্রত যে এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই তাহা বোধ হয় সেই সময় পুণ্যবতীর প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেননা পতিতোদ্ধারব্রতকল্পে অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিতে গিয়া সে পরক্ষণেই কহিল—

"শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
গেল উড়ি প্রেম-পাখী; শূন্য অঙ্কে মুছ আঁখি—
বনপুত্রগণে তব দেও অধিকার
প্রেমময়! পুত্রশোক রবে না তোমার।"

সুভদ্রাদেবীকেও সান্ত্বনা দিতে গিয়া কহিল—

"উঠ মা! উঠ মা! ওই সর্ব্বশোকনিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ!
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাই কৃষ্ণনাম মাগো! যুড়াই জীবন!
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর
কাটিলেন বিধি যদি, উধাও উড়িয়া
তুই গৃহে, আমি বনে, বনবিহঙ্গিনী মত
গাব কৃষ্ণনাম মাগো! বিশ্ব জুড়াইয়া।"

উত্তপ্ত শোক-মরুভূর মধ্যে শান্তির কি শীতল প্রস্রবণ! কি অপার্থিব প্রাণবিমোহন দৃশ্য! কি পতিতোদ্ধারমূলক প্রেমের আদর্শ চিত্র! অর্জ্জুন আত্মবিহ্বলভাবে এক করে পুত্র ও অন্য করে পুত্র-বধূকে লইয়া গোবিন্দের প্রেমপূর্ণ বক্ষে অর্পণ করিলেন। নরনারায়ণ বীরকুমার ও বিমুক্তকুন্তলা মূর্চ্ছিতা উত্তরাকে বক্ষে লইয়া যোগস্থ দণ্ডায়মান! তাঁহার পদতলে প্রীতির ও শান্তির পবিত্র তিন মূর্ত্তি—শৈল, সুভদ্রা ও পার্থ! ঊর্দ্ধবাহু দ্বৈপায়ন এই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিরাট কুরুক্ষেত্র মুখরিত করিয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিলেন—**হরে মুরারে**! উদাস নিস্তব্ধ সায়াহ্ন গগন যেন সেই উদাত্তস্বরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রেমকণ্ঠে গাহিল—"হরে মুরারে"!

* * * *

নিবিড় তমসাবৃত রজনী; তৃতীয় যাম অতীত। আকাশ ও ধরাতল গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। শৈলজা শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিতা বিষাদপ্রতিমা উত্তরার সেবায় নিযুক্ত। তাহার

অঙ্কে মূর্চ্ছিতা রমণী, নিশীথিনীর কোলে বিশুষ্ক কুসুমহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে! রমণীর—

"শোকে শুভ্র অর্দ্ধকেশ, নয়ন গিয়াছে বসি;
শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী।
বিশুষ্ক আরক্তাধর; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস;
নিদ্রা যাইতেছে যেন ছিন্ন-বীণা-শোকোচ্ছ্বাস!"

বহুক্ষণ পরে রমণীর একটু সংজ্ঞা হইল; সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে আমি?"

শৈলজা। "তুমি উত্তরা মা! আদরিণী!"

রমণী। "উত্তরা কে?"

শৈলজা। "উত্তরা মা! বিরাটরাজনন্দিনী।"

রমণী যেন বিস্মিত হইল। শিবির-প্রাচীরে এক দীর্ঘ প্রশান্ত দর্পণ আলম্বিত ছিল; সে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—

"কারা বসি ওইখানে?"

আত্মহারা বালিকার ভগ্নকণ্ঠে শৈলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে সজল নয়নে উত্তর করিল—

"কেহ নহে দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা! তোমার
দেখিতেছ—দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা! আমার।"

উত্তর শুনিয়া উত্তরার বিস্ময় যেন শত গুণ বাড়িয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"উত্তরা! উত্তরা আমি! প্রতিবিম্ব উত্তরার!
উত্তরার শুভ্রকেশ! ওই মুখ—চোখ আর?"
কে তুমি?"

তপস্বিনী শৈলজা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। গদগদ কণ্ঠে উত্তর করিল—"শৈলজা আমি, বনবালা উদাসিনী।"

. হেমন্তের শিশিরমথিতা কমলিনীর ন্যায় বিষাদক্লিষ্টা উত্তরার শোককাতর মুখখানি দেখিয়া শৈলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। নিদারুণ পতিশোক ছয়দিনের মধ্যেই বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে! শৈলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া রমণী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কহিল—

"না তুমি মা! স্বপ্নদেবী! স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি,
পূর্ণচন্দ্র বক্ষ হ'তে হায় মা! পড়িনু আমি
আঁধার পাতালে, শৈলে—কি কঠিন শিলাখানি!
চূর্ণিত করিয়া দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক
আসিলেন নারায়ণ—কি করুণাপূর্ণ মুখ!

* * * *

চুম্বিয়া ললাট করি সঞ্জীবনী সুধা দান,
পবিত্রা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান!
তুমি কি সে স্বপ্নদেবী? এযা কোন্ পুণ্যভূমি?
স্বপ্নরাজ্য? দেবরাজ্য?"

শৈল ধীরে ধীরে এই স্বপ্নের কাহিনী শুনিল। সঙ্গে সঙ্গে মহিমাময় নারায়ণের অপূর্ব্ব মহিমা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয়ের ভক্তি-সাগর উছলিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর করিল—

"তোমার শিবিরে তুমি!"

বালিকার আবার বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল—

"শিবিরে! শিবির কোথা?"

বাষ্পগদগদ কণ্ঠে শৈল উত্তর করিল—

"কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে!"

বালিকা তাহা শুনিয়া স্থিরনেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্রকরলেখা যেমন ধীরে ধীরে ধরাতলে দেখা দেয়, সেইরূপ স্মৃতির ক্ষীণালোক অল্পে অল্পে তাঁহার আঁধার মনোরাজ্যে ভাসিতে লাগিল। সুদূরবিস্মৃত সঙ্গীতের ন্যায় সুখপূর্ণ, শোকপূর্ণ কত শত জীবন-ঘটনা ধীরে ধীরে যেন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। শৈল তন্ময়ভাবে বালিকার মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিল।

সহসা যেন সে ভাব পালটিয়া গেল। বালিকার অভিনীত জীবনরঙ্গমঞ্চে কে যেন যবনিকা টানিয়া দিল—সেই রুদ্ধ নাট্যগৃহদ্বার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! বালিকা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না—অশ্রু কোথায়? শোকের তীব্র সন্তাপে যে নয়নের নির্ঝর শুকাইয়া গিয়াছে! বিশুষ্ক ইন্দীবরসম ক্ষুদ্র মুখখানি শৈলজার বক্ষে লুকাইয়া সে নীরবে পড়িয়া রহিল। শৈলজার কাতরপ্রাণ সে দুঃসহ অবস্থা অনুভব করিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। সে সস্নেহে বালিকার মুখে চুম্বন দান করিতে গেল; কিন্তু হায়!

"উষ্ণ দুই অশ্রুবিন্দু পড়িল ঝরিয়া মুখে
উত্তরার বিমলিন, শুষ্ক শতদল বুকে
নিশির শিশির যথা—"

বিস্ময়ে বালিকা প্রশ্ন করিল—

"কেন মা কাঁদিস তুই? তোর বুকে এই জ্বালা
কে জ্বালিল? বনমাতা তুই কি অভিন্ন হায়?"

শৈলের অশ্রুধারা তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল—সে কাতর স্বরে কহিল —

"আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী।"

বালিকা ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করিল—

"হায় মা! হায় মা! তোরো এ অমৃত প্রস্রবণে
জালিলা বাড়বানল বিধি অকরুণ মনে!"

যুগল হৃদয়বীণার তন্ত্রী সহানুভূতির সমান সুরে বাঁধা—শোকের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত! সুতরাং একটীর অনুরণনে অপরটী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। শৈল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—

"না মা!— * * মরুভূমে অভাগীর
দিয়া আত্মপ্রাণ বাছা, ঢালিয়াছে প্রেমনীর;
বরিষার মেঘ মত সহি বুকে বজ্রাঘাত,
ধর্ম্মরাজ্য তরে করি এইরূপে প্রাণপাত।
বনমাতা হয় যেন হায়! যোগ্য মাতা তার।
স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার!"

বালিকার মানসপটে পূর্ব্বসুখের স্মৃতি উদিত হইল—সে কাতর-কণ্ঠে কহিল—

"বড় সাধ ছিল মনে যুদ্ধ অন্তে অভাগীরে
নিয়ে যাবে বনে তোর, মা গো! তোর স্নেহনীড়ে।
ভাবে নাই—ভাবি নাই—হায়! হেন অনাথিনী
আসিব মা অঙ্কে তোর!"—

আর বলিতে হইল না—রুদ্ধ শোক-নির্ঝরিণী শৈলজার নয়ন প্রান্ত দিয়া দর দর বহিতে লাগিল—বালিকা আর কোন কথা কহিল না।

ক্ষণেক পরে শৈল সেই প্রবল শোক চাপিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা প্রদান মানসে কহিল—

"রেখে গেছে অভিমন্যু ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি ওর—
মাগো! পুণ্যগর্ভে তোর।

পুত্র কোলে করি তুই যাইবি আমার বনে,
এ অচির বনখেলা নিরখিব দুই জনে।
গৃহভূমি, বনভূমি, বাঁধিয়া প্রেম বন্ধনে
নির্ম্মাইব ধর্ম্মরাজ্য ; বসাইব সিংহাসনে
পুত্রে তোর, রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার ;
পুত্রসুখে, প্রজাসুখে, রহিবে না শোক আর !"

বালিকা শুনিল—তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল! শোকভগ্নস্বরে সে কহিল—

"রবি অস্ত গেলে হায়! দিবা কি থাকিতে পারে?
অস্ত গেলে শশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে!
পাদপ হইলে ভস্ম, ছায়া কি থাকে কখন?
নির্ঝর হইলে শুষ্ক, ধারা হয় অদর্শন;
প্রদীপ হইলে ভগ্ন, শিখা কি কখনো রয়?
বাঁচে কি নলিনী, যদি শুষ্ক হয় জলাশয়?
কুরুক্ষেত্র মহাঝড়ে, তরু উত্তরার হায়!
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
আশীর্ব্বাদ কর মাগো! সমর্পিয়া ফল তার
করে মাতা সুভদ্রার, সুলোচনা, শৈলজার,
তরু পদমূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ,
আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান।
তৃতীয়ার চন্দ্র যদি হলো অস্তমিত হায়!
অস্ফুট জ্যোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায়।"

তার পর উভয়ে শোকাবেগে নীরবে বসিয়া রহিল। বালিকা সেই শোকক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ভীষণ শোকদৃশ্য দেখিতে দেখিতে কি জানি কেন সহসা কেমন কাতর হইয়া পড়িল! তাহার মনে হইল এই নির্ম্মম যুদ্ধ আরও না জানি কত বালিকাকে তাহার ন্যায় হৃত-

সর্ব্বস্ব করিয়াছে—এই ভীষণ শোকসঙ্ঘাত আরও কত 'উত্তরা'কে পথের ভিখারিণীরূপে গড়িয়া তুলিবে। বালিকার কোমল হৃদয়তন্ত্রী পরদুঃখস্পর্শে বাজিয়া উঠিল! সে কহিল—

"নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক-পারাবার
ভাঙ্গিবে কপাল মাগো! আরো কত উত্তরার!"

শৈল তাহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিল—"হইয়াছে যুদ্ধ শেষ।"

"শেষ"!—বালিকা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তবে কি সত্য সত্যই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—এই মর্ম্মভেদী শোকানল নিভিয়াছে—জগতের এই মহাজ্বালা জুড়াইয়াছে!

শৈল গদগদ স্বরে উত্তর করিল—"শেষ!—"

"————ভস্মিয়া ক্ষত্রিয় বন
নিবিয়াছে অধর্ম্মের যুগব্যাপী হুতাশন!
ছিল যেই স্নেহে সিক্ত অর্জ্জুনের বীর্য্যানল
হরিলে কৌরব সেই অভিমন্যু স্নেহজল,
উদ্গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন
দুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পরাক্রম;
দুই দিনে কর্ণ আর—কর্ণ করে নাহি রণ,
শিশুহত্যা পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জ্জন।
এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুর্য্যোধন।
কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান
অধর্ম্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান!
কৃপ, কৃতবর্ম্মা, আর দ্রোণপুত্র দুরাশয়—
আছে মাত্র কৌরবের এই মহারথীত্রয়।

অধীর আগ্রহভরে বালিকা সকল সংবাদ লইল। সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সহসা পাণ্ডব পক্ষের কুশল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল! সে জিজ্ঞাসা করিল—

"পাণ্ডব ও নারায়ণ?"

শৈল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"আছেন মঙ্গলে সব।
পরিণামে ধর্ম্মের মা! নাহি হয় পরাভব।"

উত্তরা। "মা সুভদ্রা?"

শৈল। "দেবী তিনি, তাঁর অমঙ্গল নয়
সম্ভব মা।"

উত্তরা কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। তারপর আবার প্রশ্ন করিল—

"কুশলে ত আছে বল পিতা, ভ্রাতা, মা আমার?"

কি কঠিন প্রশ্ন! শুনিবা মাত্র শৈলের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার নয়নবিনির্গত অবিরল অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল!

বালিকা শৈলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া নিমেষের মধ্যে স্বীয় প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়া লইল। শৈলের সেই নীরব সমাচার তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের পরতে পশিয়া এক তুমুল হাহাকার সৃজন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বালিকার আর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তাহার স্তিমিত নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল না—মুখের একটী মাত্র রেখাও রূপান্তরিত হইল না। আর হইবেই বা কেন?

"হায়! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার
শত বিষধরে দংশি কি আর করিবে তার?
হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ?"

বালিকা ব্যাকুল ভাবে কেবল জিজ্ঞাসা করিল—

"সকলে মা! গেল চলি— * * *
তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক!
ছয়দিন মৃতপ্রায় ছিলাম মূর্চ্ছিতা আমি;
তবু নাহি মরিলাম—আমি কি পাষাণখানি!"

শৈল তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহার বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না; নরনারায়ণ যোগস্থ হইয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। বাঁচাইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—

"তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা গর্ভে তোমার
একই অঙ্কুর মাত্র কৌরবের ভরসার।
মানবের আশা-তরু, ধর্ম্ম-রাজ্য-ভিত্তি-ভূমি
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্মরাজ্যলক্ষ্মী তুমি!"

বালিকা বিষণ্ন বদনে, নত মস্তকে তাহা শুনিল—তার পর তাহার পঞ্চ দেবরের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শৈল তাহাকে বলিল, যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ জীবিত নাই—অশ্বত্থামা মেষশালায় শার্দ্দুলের মত প্রবেশ করিয়া পঞ্চ শিশুকে বিনষ্ট করিয়াছে। অধর্ম্মের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে—কুরুক্ষেত্র আজ শ্মশানে পরিণত। এই মহাশ্মশানে পাপ ও অধর্ম্মের করাল কবল হইতে মানবকে মুক্ত করিতে—তাহাকে মুক্তির মধুর পবিত্র পন্থা দেখাইতে গিয়া মহাপ্রাণ পুত্র অভিমন্যু স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে;

সুতরাং তুচ্ছ পত্নীপ্রেম ভুলিয়া পবিত্র মাতৃপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিলে তাহাদের এই মহাশোকে জগত সুখ লাভ করিবে।

বালিকা বিস্মিত ভাবে, স্তম্ভিত হৃদয়ে শৈলের কথাগুলি শুনিল। সহসা শীতের মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় তাহার বদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব, স্থির ভাবে থাকিয়া সে কহিল—

"————————মা! চল যাই!"

শৈল বিস্মিত নয়নে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়?"

উত্তরা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—

"মা! উত্তরার এক ভিন্ন স্থান নাই—
পতির জলন্ত চিতা।"

শৈলের বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে অশ্রুপূর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল—

"পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ'তে আর
নাহি কি রমণীব্রত উচ্চতম মা! আমার?"

বালিকা ধীরে ধীরে ভূতল ত্যাগ করিয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল—

"আছে।—
পালিব তা' মাখিয়া মা! পতিপদভস্ম শিরে।"

তারপর নীরবে দুইজনে সেই গভীর নিশীথে শিবির হইতে বাহির হইল। কুরুক্ষেত্রবক্ষে তখনো অগণিত চিতা অমাবস্যার নিবিড় সূচিকাবিদ্ধ অন্ধকারে জ্বলিতেছিল। যোজনান্তর ব্যাপিয়া সংখ্যাতীত রথীবর্গের চিতালোক নদীনীরে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল—যেন অনন্ত রবি এককালীন নদীগর্ভে অস্ত যাইতেছে! অনন্ত শ্মশানধূমে শীতের আকাশ সমাচ্ছন্ন—একটীও যেন নক্ষত্র নাই, অথবা সকল নক্ষত্রই যেন ধরাতলে খসিয়া পড়িয়া চিতার ন্যায় শোভা

পাইতেছে। বিরাট সমরভূমি যুড়িয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার—চারিধারে ভগ্নকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ! নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া শকুনি গৃধিনীর দল যেন সেই চীৎকারের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। শত শত বিভীষিকা যেন থাকিয়া থাকিয়া আঁধারে ফুটিয়া উঠিতেছিল! বালিকার বক্ষ সেই ভীষণ শোকদৃশ্য দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে শৈলের গলা জড়াইয়া শোকবিহ্বল কণ্ঠে কহিল—

"হায় মাতঃ! ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ
আমাদের বক্ষঃচিতা এরূপে কি নির্ব্বাপন
হইবে মা? হইবে মা এইরূপে অবসান
আমাদের শোকনিশি, হায়! জুড়াইবে প্রাণ?"

শৈল সাশ্রুচক্ষে কহিল—

"কয় চিতা আমাদের?———
দেখ মা! অনন্ত চিতা ভারত মাতার বক্ষে!"
পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম্ম-চিতার রাশি,
নব ধর্ম্ম-উষা ঐ আনন্দে উঠিছে ভাসি!
ঐ কাকলীর কলে উঠিছে মা! কৃষ্ণ নাম,
জুড়াতে জগত প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ।"

তার পর উত্তরাকে বক্ষে লইয়া সে অভিমন্যুর চিতাপার্শ্বে গেল। দূরে হিরণ্বতীতীরে অশোকপাদপমূলে সেই পবিত্র তীর্থধাম দেখিবামাত্র উভয়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রণাম করিল। নারায়ণ ক্ষীণালোকে অন্তরালে দাঁড়াইয়া অনিমিষনেত্রে উত্তরার সেই বিমলিন শোকছবি দেখিলেন। কি দেখিলেন?

দেখিলেন—

"গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার,
ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার!

নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ রঙ্গালয়
করিতেছে প্রৌঢ়তার কি দারুণ অভিনয়!
বিশুষ্ক অস্ফুট ফুল, নিবিয়াছে আলোরাশি,
ফুটন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে, শোক উঠিয়াছে ভাসি!
হাসিভরা, ক্রীড়াভরা সে চঞ্চলা সৌদামিনী
হয়েছে গাম্ভীর্য্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী!
জোৎস্নাপ্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুমলতা
এবে শুষ্কা, অর্দ্ধদগ্ধা হায়! বজ্রাঘাতে যথা!"

শুনিলেন উত্তরা আকুল কণ্ঠে বলিতেছে—

"কোথায় রহিলে পদ্মপলাশলোচন হরি,
এই শোকপারাবারে দেও নাথ! পদতরী!
তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়,
ছিল তব রূপ সম যে-রূপ মাধুর্য্যময়,
মাতা সুভদ্রার ছবি, সেই মুখ মনোরম,
তোমার দেবত্বে মাখা, পার্থবীর্য্যে হুতাশন,
বিধাতার পূর্ণসৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার—
এরূপে কি হল ভস্ম? চিহ্ন রহিল না আর!
অর্জ্জুনের প্রাণপুত্র, প্রাণপুত্র সুভদ্রার,
গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য—না, না নাহি মৃত্যু তার।"

বিয়োগবিধুরা পতিপাগলিনীর মর্ম্মভেদী বিলাপ শুনিতে শুনিতে নারায়ণ শোকের আবেগে প্রস্তরপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চল, নিষ্কম্পভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! শৈল এতক্ষণ আকাশে চন্দ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া যেন কি এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিল! সহসা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বীরবালকের চিতাভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উভয় ললাটে মাখিয়া উচ্ছ্বাসভরে কহিল—

"কর আশীর্ব্বাদ বৎস! তব বনযাত্রা-ব্রত
হয় যেন উদ্‌যাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ।"

দেখিতে দেখিতে পার্থ সুভদ্রা সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝটিকান্তে সুপ্ত জলধির ন্যায় পার্থের হৃদয়ে শোকের সেই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ যেন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে—তাঁহার মুখে শান্তির ছায়া বিরাজিত। বীরজননীর অনন্ত, অতলস্পর্শ শোকসিন্ধুও ধীর স্থির। পুত্রের শ্মশান-ছায়া দেখিতে দেখিতে উভয়ের হৃদয় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত একবার মাত্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় ব্যাকুল কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয়!"

ভদ্রাদেবী স্থিরচিত্তে ও স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"না-না নাথ!—
এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ
জুড়াতে জগত প্রাণ, শিখাইতে কৃষ্ণনাম।

* * * *

সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্ম্মব্রত শ্রেষ্ঠতর
মাখি পুত্রভস্ম বুকে, হও কর্ম্মে অগ্রসর।
পুত্রের সুযোগ্যা মাতা, পুত্রের সুযোগ্য পিতা
হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্লাবিতা
এই নব ধর্ম্মামৃতে; দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখশান্তি পারাবার।
শুনিতে শুনিতে যেন বিশ্বকণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
একই চিতায় লভি পতিপত্নী নিরবাণ!"

তার পর উভয়ে সেই পবিত্র চিতার ভস্ম বুকে মাখিয়া যোগী যোগিনীর বেশে শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। শৈল ও উত্তরা ধীরে ধীরে তাহাদের অনুগামিনী হইল।

নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ধ্যানস্তিমিত-লোচনে এই শোকছবি দেখিতেছিলেন। এইবার শোকোদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বীরকুমারের সেই পবিত্র চিতাভস্ম মাখিলেন। তারপর উষার আকাশপানে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—

"মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি—মানবের মুক্তিপথ
রক্তসিন্ধুগর্ভে যদি শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শ্মশানে মাত্র করি নাথ! প্রজ্বলিত
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত পারাবার, কৃষ্ণের তপ্ত শোণিত
প্রতিবিন্দু সে সিন্ধুর; হা নাথ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।

* * * *

দিলাম অনলে ঝাঁপ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
ঢালিলাম রক্তধারা অষ্টাদশ দিন ধরি;
তথাপিও প্রাণাধিক কুমারের এ শ্মশান
জ্বালালে কৃষ্ণের প্রাণে হায়! নাথ! অনির্ব্বাণ।
নিষ্পাপ মানবপুত্র নাহি দিলে বলিদান
আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানুষের পরিত্রাণ?
নাহি দুঃখ, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
তুমি চাহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান

পাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনস্কাম !—
কর এবে ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য নিরমাণ !
ও কি দৃশ্য !

তাই ত ! ও কি পবিত্র মহিমাময় অপার্থিব দৃশ্য ! যোগস্থ নরনারায়ণ দেখিলেন যেন বীরকুমারের চিতা পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। সে পবিত্র চিতাগ্নির লোলশিখা যেন প্রভাতের নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। সমগ্র সমরক্ষেত্র যেন চিতানলে ছাইয়া গেল। আর সেই পবিত্র পাবক মধ্য হইতে ত্রিভুবন রূপে আলো করিয়া প্রকট হইলেন এক অতুল প্রতিভান্বিতা মহিয়সী মাতৃমূর্ত্তি ! রক্তাম্বর-পরিধানা, কিরীটার্দ্ধেন্দুশেখরা সেই অনিন্দ্যসুন্দরী নারী যেন "মহাভারতের মূর্ত্তি—যেন রাজরাজেশ্বরী আনন্দময়ী জননী ! তাঁহার বেদিমূল পবিত্র নিষ্কামধর্ম্মে গঠিত—তাঁহার চারিভুজে পাশাঙ্কুশ, ধনুঃশর চারিদিকে শোভমান—তাঁহার ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান বিরাজিত। সেই সুপবিত্র বেদীমূল বেষ্টন করিয়া আর্য্য-অনার্য্যের দেবতাগণ ধ্যাননিমগ্ন। ধর্ম্ম-সাম্রাজ্ঞীর মুখ অনন্ত-মহিমা-মণ্ডিত—যেন প্রভাতের আকাশে শান্ত বালরবি উদ্ভাসিত ! অনন্ত মানব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গান করিতেছে। আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নয়নে নারায়ণ এই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মানব-প্রেমে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া কুমারের চিতাপার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিরাট কুরুক্ষেত্র ব্যাপিয়া যেন সহসা কি অনন্ত মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল !— ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল।

সেই শুভলগ্নে—সেই ত্রিদিববাঞ্ছিত মাহেন্দ্রক্ষণে ধর্ম্মের জয়-গানে উদ্বুদ্ধ ও বিভোর হইয়া ভদ্রার্জ্জুন এবং শৈল সহ দ্বৈপায়ন ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"অগ্রে" কুমারের চিতা, পূরব গগন পানে
চাহি স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে
উভয়ের—তিন যুগ ভাসে প্রেম-অশ্রু জলে।
তিনেরি গৈরিক বেশ, বুক চিতাভস্মে মাখা
ভদ্রার গৈরিক আলুলায়িত কুন্তল ঢাকা।
চিতার অপর পার্শ্বে জানু পাতি ধরাতলে
বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল ধারা-যুগলে।"

দেবর্ষি দ্বৈপায়ন প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে এক অপার্থিব ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তর ভূমানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধীরগম্ভীর স্বরে দেব-নর-ঋষিকে আহ্বান করিয়া তিনি কহিলেন—

"কি ত্রিমূর্ত্তি অপার্থিব! ভারত-জগত-বাসি!
দেবগণ! ঋষিগণ! একবার দেখ আসি!
জ্ঞানদেব নারায়ণ; বলদেব ধনঞ্জয়;
মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা; সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্মবিসর্জ্জন; জ্ঞান, বল, আত্মদান
ভক্তির নিষ্কামসূত্রে সম্মিলিত, সমপ্রাণ।
এই চতুর্ব্বর্গ, এই মানবের মোক্ষধাম—
দ্বাপরের অবতার, পূর্ণ তব মনস্কাম।

* * * *

নারায়ণ! জগন্নাথ! দেও শক্তি ধরি ধ্যান,
আনন্দে গাইব তব এ **মহাভারত** গান।
শুনিয়া সে গীত, করি কৃষ্ণনামামৃত পান
মানব লভিবে মুক্তি, ধরা হবে স্বর্গধাম।"

শৈল এতক্ষণ এই মহান তীর্থধামে বসিয়া বিশ্বপ্রেমে আকুল হইয়া তাহার নিদ্রার স্বপ্ন—জাগরণের ধ্যান—সেই অনার্য্যোদ্ধাররূপ ব্রত উদ্যাপনের আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল। এইবার গুরুদেবের পদরজঃ শিরে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে আকুল হইয়া কহিল—

"হে গুরো! কৃপায় তব, হা পুত্র! স্নেহেতে তোর
অনার্য্যা মাতার তোর আজি নারীজন্ম ভোর।
জগন্নাথ! জগৎপতে! আর্য্য-অনার্য্যের হরি!
হে নীলমাধব! দেও পদাম্বুজ দয়া করি
পতিত অনার্য্যগণে, পতিতপাবন নাম
দেও বনপুত্র মুখে, ধর্ম্মরাজ্যে দেও স্থান।"

কুরুক্ষেত্রে শৈলজার এই শেষ প্রার্থনা। পতিতোদ্ধারব্রতনিরতা প্রেমিকার এই প্রেমপূর্ণ প্রার্থনার ছত্রে ছত্রে তাহার নিষ্কাম ভাব কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, রসজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। অতঃপর আমরা শৈলকে এই পুণ্যব্রত উদ্যাপনের নিমিত্ত **প্রভাসে** দেখিতে পাইব। কিন্তু তাহাকে তাহার সেই পবিত্র রঙ্গভূমে—সেই আর্য্য ও অনার্য্যের মহাসম্মিলনরূপ তীর্থধামে দেখিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গকে তাহার রৈবতকমূর্ত্তির সহিত একবার এই **কুরুক্ষেত্রের** মহিয়সী, সেবিকা নারীমূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন রৈবতকের সেই মানবী-শৈলজা কুরুক্ষেত্রে কর্ম্মবলে ও জ্ঞানবলে কিরূপ গরিয়সী নারীমহিমায় মণ্ডিতা! কুরুক্ষেত্রে শৈলজার মহান্ স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব্ব আত্মসংযম, অলৌকিক বিশ্বপ্রেম বাস্তবিকই তাহাকে পতিতা অনার্য্যা নারীর আসন হইতে আর্য্যের আদর্শরূপা রমণী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের শৈলজা কবির অদ্ভুত সৃষ্টি হইলেও—

শিক্ষাগুণে, কর্ম্মগুণে যে মানব মহত্ত্বের আসন অধিকার করিতে পারে, তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য লাভ করিয়া আমরা কবির এই সৃষ্টিকে একবারে অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।



তৃতীয় অধ্যায়

বেদান্ত-প্রসঙ্গে

শৈলজা প্রভাসে আসিল।

পতিতোদ্ধারব্রতনিরতা প্রেমিকা রমণী প্রভাসে আসিয়া তাহার চিরবাঞ্ছিত সাধ—অনার্য্যোদ্ধাররূপ পুণ্যব্রত উদ্যাপনে ব্রতী হইল। এই কঠোর ব্রত পালনে যে শিক্ষা, যে সাধনার প্রয়োজন, তাপসী শৈলজা, সৌভাগ্যবলে ভদ্রাদেবী ও ব্যাসদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, সে শিক্ষা ও সে সাধনার পূর্ণমাত্রায় অধিকারিণী হইয়াছে। কঠোর পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ব্রতচারিণীর ত্যাগ, সংযম ও সত্যনিষ্ঠারূপ কাঞ্চন কষিত হইয়া আজ শতগুণ ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে! কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে শৈলজা আজ নারী হইলেও দেবী; এবং সর্ব্বোপরি স্বয়ং নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজে আশ্রয় লাভ করিয়া সে ধন্যা ও কৃতার্থন্মন্যা। সুতরাং এ হেন শুদ্ধান্তঃচারিণী তাপসী মহিলার পুণ্য ব্রত যে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আমরা কিয়ৎ পরেই দেখিতে পাইব আর্য্য ও অনার্য্যের পবিত্র সম্মিলন-ভূমি এই পুণ্য প্রভাসক্ষেত্রে প্রেমিকা শৈলজা প্রেমবলে সকল ভেদাভেদ, সকল বিরোধ, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া কেমন এক অসীম শান্তি ও অনন্ত প্রেমের রাজ্য **মহাভারত** স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করিয়াছিল! কিন্তু নরনারায়ণের সেই—

"এক ধর্ম্ম এক জাতি এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্ব্বভূতহিত,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,
'একমেবাদ্বিতীয়ং"-এর প্রতিষ্ঠার মূলে তাপসী শৈলজার শেষ আত্মদানের পরিমাণ বুঝিতে না পারিলে, শৈলজা-চরিত্রের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। অতএব উত্তর জীবনে শৈলজার শিক্ষা ও সাধনা কিরূপ ভাবে ফলবতী হইয়াছিল, আমরা এইবার তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরানল নির্ব্বাপিত। ভারত ব্যাপিয়া অশান্তির সে প্রবল ঝটিকা গর্জ্জন, অধর্ম্মের সে তাণ্ডবনৃত্য, সাধুদের সে মর্ম্মভেদী হাহাকার আর আসমুদ্রহিমাচল কম্পিত করিয়া ছুটে না। ভীষণ ঝটিকান্তে আজ শ্যামলা প্রকৃতির ন্যায় সুহাসিনী ভারত-জননী নির্ম্মল সুশীতল শান্তি-জ্যোৎস্নায় বিমণ্ডিতা। সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

বানিজ্যের রুদ্ধ স্রোত ছুটেছে আবার
প্লাবি ধনধান্যে ধরা; রুদ্ধ জ্ঞান-স্রোত
দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবার
লঙ্ঘি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনন্তের,
তত্ত্বরত্নে পূর্ণ করি জ্ঞানের ভাণ্ডার
এক সিন্ধুগর্ভে; এক স্বর্ণ সরসিজে
বিরাজিত নব প্রেমে গলাগলি করি
বনমাতা, জ্ঞানমাতা—চিরবিরোধিনী—
আলিঙ্গিয়া নারায়ণে। শান্তি পারাবার
সেই সিন্ধু; নবরাজ্য সেই শতদল;
সেই নারায়ণ **কৃষ্ণ!** শান্তি পারাবার
গাইতেছে কৃষ্ণনাম অনন্ত উচ্ছ্বাসে।
নবরাজ্য নীরজের অক্ষয় মৃণাল
কৃষ্ণনাম; **নবধর্ম্ম, মন্ত্র কৃষ্ণনাম!**

কিন্তু এহেন বিরাট শান্তির মাঝেও একটী রমণীর অশান্ত হৃদয় অহরহ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল। ভারত প্লাবিয়া বিশ্বে যে মহাপূর্ণিমার সঞ্চার হইয়াছিল, এই রমণীর নিরাশাকাতর অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেই পূর্ণিমার শান্তিশশধর আশার বা আশ্বাসের একটিও জ্যোৎস্না-রেখাপাত করিতে পারে নাই! রমণী একাকিনী একটি

জোৎস্না-স্নাত শৈলশেখরে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে চন্দ্রালোকিত বিশ্বের অনুপম রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার বিদীর্ণ, বিক্ষত হৃদয় আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় যেন অজস্রধারায় তপ্ত গৈরিকস্রাব বর্ষণ করিতেছিল! নীরব নিকম্প ভাবে সেই গগনবিহারী চন্দ্র দেখিতে দেখিতে রমণীর কৈশোর ও যৌবনের বিফল স্বপ্নরাজি একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে চিরবাঞ্ছিত কাহার ধ্যানে যেন তন্ময় করিয়া তুলিল! অকস্মাৎ সেই নিবিড়, নীরব শৈলশেখর ধ্বনিত করিয়া কে যেন তাহাকে চিরপরিচিত মধুরকণ্ঠে ডাকিল— 'দিদি!' রমণী চমকিয়া উঠিল! এমন মধুরকণ্ঠে ত তাহাকে বহুদিন কেহ ডাকে নাই। বহুদিনবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায়, সুদূরবিশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় এই সুধামাখা কণ্ঠ কাহার? কে এ রমণী?

বিস্ময়জড়িত স্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিল :—

"কে তুমি?, * * * *
আকাশের দেবী?
কিম্বা বনদেবী বল?
কিম্বা, শশাঙ্কের অঙ্কবিহারিণী
শান্তি-সুধা নিরমল?"

নবাগতা কোন উত্তর করিল না—আবার প্রেমবিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল—"দিদি!" এবার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমণীর বিস্ময় ও কৌতুহল যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। এ মধুর কণ্ঠ যে শৈলের—তবে কি শৈল জীবিত আছে? সংশয় ও সন্দেহ আসিয়া রমণী-হৃদয় অধিকার করিল। রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিল :—

"কেন দেবী! এলে তুমি
অভাগিনী শৈল ধরি তার রূপ
ছলিতে এ মরুভূমি!

সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি
নিষ্ঠুর বিধির খেলা!
জ্বালিল যে মরু উভয়ের প্রাণ,
নাহি তার সীমা বেলা।
সে মরুদহনে দহিয়া দহিয়া
আমার সে শৈলফুল,
হয়েছে আকাশে ওই শান্তি-তারা
দেখ কি শোভা অতুল!
আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়া
বসি নীলাকাশ তলে
ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়া
ভাসি স্মৃতি-স্রোতোবলে।”

সত্যই রমণীর স্মৃতিসাগর উথলিয়া উঠিল। সে স্তম্ভিতভাবে শৈলের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এইখানে রমণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া রাখি। রমণী নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু। শৈল বাসুকির পিতৃব্যকন্যা তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। সুভদ্রার পাণি-প্রার্থী বাসুকি, তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী পার্থকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, যে ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করিয়া শৈলের প্রথম জীবন মরুময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহাদের স্মরণ আছে। আর্য্যদ্বেষী বাসুকি কিন্তু শৈলকেই শুধু এই প্রকার পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, কৃষ্ণবিদ্বেষী মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় আর্য্য-নিপাতকল্পে ঋষিপ্রবরের হস্তে সহোদরা ভগ্নী জরৎকারুকেও সমর্পণ করিয়াছিল। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় বাসুকি, শৈল ও জরৎ-কারুকে প্রাণ দিয়া পালন করিয়াছিল। সুতরাং শৈল বা কারু

কেহই প্রথমটা বাসুকির আদেশের অনাথ্যচরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বিধাতার দুর্জ্ঞেয় নীতিবলে, সঙ্গপ্রভাবে শৈলের চরিত্রের কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কারু ও বাসুকির চরিত্রেরও সেইরূপ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের কাহিনী আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিব।

সে যাহাহউক, শৈলজা আর স্নেহের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কহিল—

"দিদি! দিদি! আমি সেই শৈল তব
মরে নাই শৈল তোর—
ভগ্নী পুণ্যবতী, পুণ্যবান ভাই
প্রেম পুণ্য পারাবার,
তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী
দিদি কি অভাগ্য তার?"

কারু আনন্দে অধীর হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় শৈলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"তুই শৈল! তুই আমাদের শৈল।

সেই ক্ষুদ্র স্নেহলতা!
তুই শৈল! সেই স্নেহের পুতুল!—"

উচ্ছ্বাসের আবেগে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল—সে শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল—

"তুই সে শৈল, স্নেহ-মন্দাকিনী,
আমার প্রাণের আধা!
তুই ক্ষুদ্র বীণা— শৈল, জরৎকারু,
একস্বরে প্রাণে বাঁধা।

নাগরাজ্-প্রেম সেই এক স্বর,
আমাদের এক প্রাণ ;
পিতৃমাতৃহীনা আমরা দু'জন—
সে প্রেমে হয়নি জ্ঞান।
নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা,
নাগরাজ ভগ্নী ভ্রাতা,
করুণ, কিশোর, প্রেমময় ভ্রাতা,
আমাদের প্রাণদাতা।
বাঁচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে,
খেলি সেই একই খেলা.
সেই প্রেমবক্ষে, দুদিকে দুজন
ঘুমায়েছি দুই বেলা।
সেই বুক হায়! শুষ্ক আধখানি
শৈলরে বিরহে তোর ;
বিরহেরে তোর হইয়াছে শুষ্ক
আধখানি বুক মোর !
অর্দ্ধশুষ্ক বুকে, আয় দিদি ! আয় !
ডাক পুনঃ দিদি বলি,
দেখি এই মুখ, শুনি সেই কথা,
পাষাণ যাউক গলি।
দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা,
হায় ! দিদি ! কতদিন—
আয় দিদি ! আয় অদ্বয় মুখে মুখে
বুকে বুক করি লীন।"

কি স্বর্গীয় স্নেহ! কি মধুর প্রীতি ও ভালবাসা! স্নেহ-প্রীতির এমন সুখস্বর্গে কে বঞ্চিত হইতে চায়? শৈল অশ্রুসজল নেত্রে কারুর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল—কহিল

"দিদি! দিদি! দিদি! দিদি প্রেমময়ী!
ভগিনী—জননী সমা!
অহো! দুটি প্রাণে দিয়েছি কি ব্যথা!
দিদি, কি করিবি ক্ষমা?"

কারু সবেগে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাম্বরে থাকিয়া শশাঙ্কদেব দুই ভগিনীর এই পবিত্র প্রেম-সম্মিলনের মাধুরী উপভোগ করিলেন। কারুর অদৃষ্টে কিন্তু এই মিলন-সুখ সম্ভোগে বাধা পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শৈল বাম অংসোপরে কারুর মস্তক রক্ষা করিয়া তাহার মুখে চোখে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে কারুর জ্ঞান সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া বসিয়া শৈলকে বুকে লইয়া একে একে বিগত জীবনের নানা সুখস্মৃতির উল্লেখ করিতে লাগিল। শৈশবে কেমন সুখে তাহারা কাননে কাননে মৃগশিশুর মত বিহার করিয়া বেড়াইত—শিখিনী পেখম খুলিয়া নৃত্য করিলে তাহারা কেমন অঞ্চল প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিত—কাননান্তরালে শ্যামা বা কোকিল মধুরকণ্ঠে কূজন করিলে তাহারা তাহাদের স্বর অনুকরণ করিয়া কেমন গান করিত—মধ্যাহ্ন ছায়ায় অথবা ফুল্ল জ্যোৎস্নায় সিন্ধুতীরে, প্রস্রবণ পারে, কিম্বা প্রপাতের ধারে বসিয়া বনকপোতীর ন্যায় উভয়ে কত গান কত হাসি ও কত খেলা করিত—কিশোর উচ্ছ্বাসে কিশোর ভ্রাতা নাগরাজের গলা ধরিয়া কেমন একটি বনফল তিনখণ্ড করিয়া তাহারা তিনজনে সুখে বাটিয়া খাইত—একে একে এমনি সব সুখের স্মৃতি মনে পড়িতে

লাগিল। একদিনের স্মৃতি আজিও কারুর হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সে বেদনাময় স্মৃতি যে কারু জীবনে কখনও ভুলিতে পারে না। তাহার বর্ত্তমান জীবনে যে সেই বেদনাময় স্মৃতির পুনরভিনয় হইতেছে! কারু তাই সেই স্মৃতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

"একদিন বনে—পড়ে কি লো মনে?"

* * * *

দেখিলাম এক সলতা পাদপ
বিশুষ্ক পাদপ, লতা।
চারি দিকে চারু শোভে বনস্থলী
পল্লবে কুসুমে ফলে,
এ পাদপ লতা ফলপুষ্পহীন
ঝরে পত্র পলে পলে ;
শুষ্ক বৃক্ষ লতা দেখি করুণায়
দুটি প্রাণ ছল ছল—
পড়ে কিলো মনে, কতই করুণা,
ঢালিলাম কত জল?
আজি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু,
আমরা সে শুষ্ক লতা
ফলফুলহীন হায়! তিন জন!
বিশুষ্ক পল্লব যথা,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া,
দেহ-শোভা পলে পলে,
শুষ্ক তিন জন একই উত্তাপে,
একই নিরাশানলে!"

শৈল ভগিনীর এই স্নেহ-মাখা উচ্ছ্বাস শুনিয়া মুগ্ধ হইল বটে; কিন্তু শৈল ত আর সে শৈল নাই যে এই মরীচিকায় পথভ্রান্ত হইবে। সে শান্ত কণ্ঠে কহিল—

"নিরাশা! নিরাশা! নিরাশা কি দিদি!"
সুখের সংসার হায়! এইরূপে
নরে মরীচিকা দহে!
সুভদ্রার প্রেম, দিদি! কৃষ্ণপ্রেম
যাদের প্রাণের আশা,
সুধার সাগরে ডুবেছে তাহারা
কি নিরাশা! কি পিপাসা!"

কিন্তু চারুর অদৃষ্টে এই দুই প্রেমের কোন প্রেমের আশাই ফলবতী হয় নাই। কৃষ্ণপ্রেমও তাহার জীবনের চিরলক্ষ্য ছিল—কৃষ্ণ যে তাহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র ধ্যান ধারণা ও লক্ষ্য—আজিও যে সেই প্রেমের আশা তাহার অন্তরের অন্তরে চিরবিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়? সে সাধ, সে আশা তাহার পূর্ণ হইল কই? ক্রূর, কৃষ্ণবিদ্বেষী দুর্ব্বাসার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীরূপে থাকিয়া তাহার সে প্রেম চরিতার্থ করিবার অবসর কোথায়? সুতরাং তাহার জীবন নিরাশাসঙ্কুল নহে ত কি! চারু জানিত মাত্র শৈলজা অর্জ্জুনের প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু অর্জ্জুন-উপাসিকা শৈলজার প্রেম কি আশাতীতরূপে ফলবতী হইয়াছিল তাহা সে জানিত না। তাহার মনে হইত, শৈলজাও তাহারই ন্যায় প্রেমের নিরাশানলে পুড়িয়া ছাই হইতেছে। তাই শৈলের পূর্ব্ব উক্তিতে চারু না বলিয়া থাকিতে পারিল না—

"অর্জ্জুনের প্রেম নহে মরীচিকা!
সে কি সরোবর চারু!"

শৈলু এ শ্লেষের অর্থ বুঝিতে পারিল ; কিন্তু নিরাশা-অনলে পুড়িলেও সে ত কারুর মত বিফলমনোরথ হয় নাই। সাধনার প্রকৃত পথ ও স্তরবিশেষ বুঝিবার ও চিনিবার অবসর লাভ করিয়া সে যে প্রবল নিরাশার অন্ধকারে আশা ও আশ্বাসের আলোক দেখিতে পাইয়াছে। তাই আজ সে কারুকে কহিল—

"আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের,
আছে খেলা যৌবনের,
অর্জ্জুনের প্রেম, যৌবনের খেলা
উন্মেষিত হৃদয়ের।
কিন্তু দিদি! খেলা নহে মরীচিকা,
সুখের সোপান স্তর!
খেলিয়া খেলিয়া, সোপানে সোপানে
উঠি ঊর্দ্ধে নিরন্তর!
পুতুল লইয়া খেলিয়া পূজিয়া,
খেলিতে পূজিতে শিখি,
মানুষ পুতুল লইয়া যৌবনে
খেলিয়া পূজিয়া দেখি ;
মানুষ পুতুল ছাড়িয়া হৃদয়ে,
অন্বেষি পুতুল আর
সে পুতুল কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য
জীবনের এ খেলার।"

আর বলিল—এই কৃষ্ণপ্রেমসায়রে ডুব দিতে না পারিলে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বা নিরাশার নিবৃত্তি হয় না।

"সে প্রেম সাগরে হইবে নিবৃত্তি
আশার ও নিরাশার,

সে সুধাসাগরে না উঠে গরল,
মরীচিকা নিরাশার।"

কারু উৎকর্ণ হইয়া শৈলের এই উপদেশ-সুধা পান করিতেছিল —কিন্তু যেই 'কৃষ্ণপ্রেমের' কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোষে ক্ষোভে ফুলিয়া উঠিল। উন্মাদিনী রমণী ভুজঙ্গদংশিতার ন্যায় শৈলকে শিলাভূমে ফেলিয়া সবেগে লাফাইয়া উঠিল। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে শৈলজার মুখপানে চাহিয়া কহিল—

"সুধার সাগর কৃষ্ণপ্রেম শৈল!
যে প্রেমে হৃদয় দহে!

* * *

কৃষ্ণপ্রেম সুধা! দন্তে ভুজঙ্গের
সুধা তবে রহে বল!
সুধা তবে রহে আগ্নেয় ভূধরে
গৈরিক সুধা তরল!
সেই কৃষ্ণপ্রেমে জ্বলিয়া পুড়িয়া
এরূপ হইনু ছাই!
সেই প্রেমশিখা এই ভস্ম মাঝে
জ্বলিছে বিরাম নাই।
সেই প্রেমে জ্বলি উন্মাদিনী মত
ছুটিয়াছি বনে বনে!
ডুবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে,
পশিয়াছি ঘোর বনে!"

এই নৈরাশ্যপীড়িতা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা রমণীর কাতরতা শৈলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে কারুকে নিবৃত্ত করিয়া কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী
যাদব পুরীতে ঘুরি',
ভীমা মুক্তকেশী বেড়াতে নিশীথে
আতঙ্কে পুরিয়া পুরী ?"

কারু। 'আমি।'

শৈল। 'তুমি।'

কারু। আমি ! আমি মুক্তকেশী
ভীমা উন্মাদিনী আমি !
জ্বলি সে জ্বালায়—কি দারুণ জ্বালা
জানেন অন্তরযামী !—"

তারপর কেমন করিয়া মণিহারা ফণিণীর ন্যায় কক্ষে কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে কখনও রুক্মিণী, কখনও বা সত্যভামার গলে তাহার চিরবাঞ্ছিত মণির সন্ধান পাইয়া, এই প্রেমবিহ্বলা রমণীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিত—হৃদয় দলিত মথিত করিয়া নৈরাশ্যের প্রবল বহ্নি নয়ন যুগল দিয়া ঠিকরিয়া বাহির হইত, কারু ধীরে ধীরে তাহার উল্লেখ করিতে লাগিল।

শৈল এই প্রেমোন্মাদিনী রমণীকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া কহিল,

"কিন্তু দিদি ! তুমি—ঋষিপত্নী তুমি,
তুমি পুত্রবতী নারী !
জান তুমি দিদি ! রমণীর প্রেম
পবিত্র জাহ্নবী বারি !"

কিন্তু হায় ! শৈলের এই উক্তি কারুকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিল। পাগলিনীর ন্যায় হাসি হাসিয়া কারু প্রশ্ন করিল—

"শত রবি শশী নক্ষত্র অশেষ
ভাসে না জাহ্নবী বুকে?"

শৈল। "ভাসে প্রতিবিম্ব, জানে না জাহ্নবী,
ধায় এক সিন্ধুপানে।"

কারু। "এক পারাবারে গতি সে আমার—
কি গতি এ দগ্ধ প্রাণে!
পড়ে প্রতিবিম্ব জাহ্নবীর বুকে
নাহি পড়ে এই প্রাণে।
এক প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ বুক
জাগ্রতে, নিদ্রায়, ধ্যানে।"

আর ঋষি পত্নী?

"ঋষি পত্নী আমি!—পুত্রবতী আমি!
দিদিরে ছলনা সার!
আর্য্য ঋষি কভু অনার্য্যা নারীরে
করে কি বিবাহ আর?

* * *

ছল পতি ঋষি, এই ছলনায়
সাধিতে স্বকার্য্য তার,
ছলপত্নী আমি, দিদি! অনার্য্যের
করিবে রাজ্য উদ্ধার!

শৈল বাধা দিয়া কহিল—"দিদি! পুত্র তব?

কারু। রাধের দ্বিতীয়!
হরিয়া সতীত্ব কার,

ঋষি দুরাচার, আনিল কুমার
অর্পিল করে আমার।
নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া মুখ
দ্রবিল হৃদয় মম,
সরল, সুন্দর এ শিশু হীরক
পালিয়াছি খনি সম।

* * *

যেই দিন দিদি! নখ মাত্র মম
ছুঁইবেন ঋষিবর,
জানেন আপনি হইবে চূর্ণিত
সেদিন অস্থি পঞ্জর।"

অতীত কাহিনীর উল্লেখ করিতে গিয়া ভগ্নহৃদয়া রমণীর প্রাণে আবার শৈশব ও কৈশোরের মধুময় স্বপ্নরাজি ভাসিয়া উঠিল। সে কহিল—

"শৈশবে, কৈশোরে, সিন্ধুনদতীরে
বসিয়া দুজনে সুখে,
দেখিতাম রবি সহস্র হইয়া
ভাসিত সিন্ধুর বুকে।
সেইরূপ দিদি! সহস্র হইয়া
ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে,
ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
কৃষ্ণ শিরাস্রোতে বহে।
হৃদয়েতে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ নয়নেতে,
অধরেতে কৃষ্ণ নাম,

শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরশনে
নাসিকায় কৃষ্ণ ঘ্রাণ।

*　　　*　　　*

কৃষ্ণ বিনা দিদি! এ দেহে হৃদয়ে
কিছু নাহি মম আর।"

রমণী আর বলিতে পারিল না—কটিবিলম্বিত তীক্ষ্ণ অসি নিষ্কাশিত পূর্ব্বক হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার জন্য বক্ষে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। শৈল বিজলীর বেগে উঠিয়া সবলে সেই অসি ছিনাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তথাপি রমণীর বক্ষ বহিয়া রক্ত ধারা গড়াইতে লাগিল। শৈল আর স্থির থাকিতে পারিল না। এই কৃষ্ণগতপ্রাণা রমণীর আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র দেখিয়া আত্মহারার ন্যায় তাহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িয়া গদগদ কণ্ঠে কহিল—

"দিদি। দিদি! ওমা তুমি প্রেমময়ী,
প্রেমস্বরূপিনী তুমি!
দেও কৃষ্ণপ্রেম, ভগিনী কন্যায়!
উদ্ধার এ বনভূমি!
দেখ পতি তব, জগতের পতি
খুলি নেত্র আবরণ।
তিনি পতি তব, তিনি পতি মম,
তিনি **নর-নারায়ণ**!"

আমরা প্রারম্ভেই ভগিনীযুগলের এই মধুর মিলন-ছবির পরিচয় দিয়া রাখিলাম। নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত প্রতিষ্ঠা-কল্পে শৈলজার আত্মদানের সহিত কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধা কারুর বাঞ্ছিত লক্ষ্য-সাধনকল্পে এই আত্মত্যাগের বিশেষ সংযোগ আছে বলিয়াই এই পরিচয় প্রসঙ্গে শৈলভগিনী কারুর নিরাশ জীবনের ও চরিত্রের

যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ পূর্ব্বাহ্ণে করিলাম। অতঃপর যথাস্থানে এই সংযোগের বিবরণ পাইবেন।

* * * * *

শৈলজা প্রভাসে আসিল। প্রেমময়ী সন্ন্যাসিনী কুরুক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাসদেবের কাছে অনার্য্যোদ্ধার-ব্রত উদ্‌যাপনের যে সহজ সরল সাধনা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা একবার ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া লইল। তাহার মনে পড়িল—

"——————চন্দ্রচূড়-সুতে
গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিণী মত
পতিত পাবন নাম; অনার্য্য-উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।"

তাই সে প্রভাসে আসিয়াও—

"ভারতের শান্তি মন্ত্র, ভারতের রাজ্যমন্ত্র,

মুক্তি মন্ত্র প্রৌঢ়ে ভারতের"—সেই নাম, সেই সুপবিত্র কৃষ্ণনাম প্রচারে আপনাকে নিয়োজিত করিল।

"গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,
গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে,
লুকাইয়া মুখ মা'র বুকে।
বনের পাখীও যেন গাইতেছে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ শিখী,
বহিছে বননির্ঝর, মর্ম্মরিছে তরুগণ,
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি।"

শুধু তাহাই নহে। বনবাসিনী অনার্য্যা রমণীগণ গৈরিক সাজে সাজিয়া, সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণনাম লিখিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে শৈলজাকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। কেহ পতির শয্যা, কেহ কোলের শিশু ছাড়িয়া, ছুটিয়া আসিয়া শৈলের পায়ে পড়িয়া কহিতে লাগিল—

"————————————দে মা কৃষ্ণনাম,
একবার দেখা নীলমণি!"

বনশিশুগণ কেহ কৃষ্ণ, কেহ গোপবালক সাজিয়া—"শিরে চুড়া, অঙ্গে পীতধড়া, বামকরে ক্ষুদ্র বেণু, পাচনি দক্ষিণ করে" লইয়া এবং বনবালাগণ বনফুলে অঙ্গ শোভিত করিয়া, বনমালা গলে ধারণ করিয়া, গোপী সাজিয়া, জলে স্থলে, গিরিশৃঙ্গে, গৃহে বনে, মধুর ব্রজলীলা অভিনয় করিতে লাগিল। অনার্য্যপালিতা বনভূমি পুণ্যবতী শৈলজার পুণ্যস্পর্শে প্রেম ও আনন্দের লীলাভূমি হইয়া উঠিল! গুরুতর রাজদণ্ডে অনার্য্যের যে নৃশংস কঠিন হৃদয়কে স্ববশে আনিতে পারে নাই, আজ নাম-মহাত্ম্যে প্রেম-অশ্রুজলে শৈলজা সে হৃদয় গলাইয়া ফেলিল—কঠিন পাষাণ-বক্ষে শীতল, নির্ম্মল, সুধাময় উৎসের সৃজন করিল। অনার্য্যের অশান্তিপূর্ণ রাজ্য ক্রমে যেন কি এক শান্তিময়, প্রীতিময় ও আনন্দময় রাজ্যে রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

সেদিন মধুর বাসন্তী পূর্ণিমা। মধুর ঊষায় প্রভাসের মহাসিন্ধুতীর প্রকম্পিত করিয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে "হরিবোল হরি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি" ধ্বনি উঠিয়াছে! নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সৈকতশায়ী শিবির সম্মুখে লক্ষ লক্ষ যাত্রী আনন্দে অধীর হইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে" রবে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে। আর্য্য ও অনার্য্যের আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দে তারকব্রহ্ম নাম গাহিতে গাহিতে করতালি সহকারে নৃত্য করিতেছে। সকলেই নরচক্ষে নরনারায়ণের দর্শন লালসায় অধীর ও

ব্যাকুল! এমন সময় ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। এক সূর্য্যে প্রভাসের মহাসিন্ধু প্রদীপ্ত হইয়াছিল—অন্য সূর্য্যে মহাকালের সাগর প্রভান্বিত হইয়া উঠিল! অগণিত নরনারী দেখিল—

"চূড়াবদ্ধ কেশ মোহন মুকুট
নীলমণি অংসে উবসে আর,
শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারু
অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার!
করুণা মহিমা, ললাটে নয়নে,
করুণা মহিমা উরস ভরা,
সুধাকর-সুধা করুণা মহিমা
বহিতেছে যেন প্লাবিয়া ধরা।"
অনিমিষ নীল নীলাজ নয়ন,
আকর্ণবিশ্রান্ত প্রেমে ছল ছল,
চাহি বসন্তের নীলাকাশ পানে
নীলমণি মূর্ত্তি স্থির অবিচল!"

তাহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া চিরবাঞ্ছিতের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িল—ভক্তি-অশ্রুজলে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিতে লাগিল। প্রেমময়কে প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধিবার জন্য শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভাবে সেই অগণিত নরনারী তাঁহার সেবা পূজায় তৎপর হইল।

"কেহ পুষ্পমালা পরায় গলায়,
চাঁচর চূড়ায় পরায় কেহ;
করে পদে অঙ্গে দেয় পুষ্পমালা,
চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দেহ।
কেহ দেয় করে সুমোহন বাঁশী,
কেহ দেয় করে পাচনি বাড়ি;

কেহ করে তুলি দেয় চারু শিঙ্গা,
ব্রজলীলা রঙ্গে মত্ত নরনারী।
কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে ভাসিয়া
গায় নরনারী শৈশব লীলা,
গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার
সখ্যপ্রেমোচ্ছ্বাসে দ্রবিয়া শিলা।
গায় রাসলীলা হইয়া তন্ময়
কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল;
কোথায় বা গায় কুরুক্ষেত্র লীলা
শান্ত দাস্য প্রেমে নেত্র ছল ছল।
সকলেই দেখে আপন গলায়,
অঙ্কে বক্ষে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো সখা,
কারো প্রাণপতি, প্রণয়ী কাহার।"

সমগ্র প্রভাস আজ যেন নব বৃন্দাবনে পরিণত—প্রেমের সিন্ধু আজ যেন নূতন করিয়া উজান বহিয়াছে! নরনারায়ণ এই মানব-সিন্ধুর প্রতি একবার নেত্রপাত করিলেন—দেখিলেন, অনন্ত সিন্ধু-সৈকতে মানব-সিন্ধুর অনন্ত লহরী বিরাজমান! তৃষ্ণা, ক্ষুধা বা অবসাদ নাই—আর্য্য কি অনার্য্য কোন ভেদজ্ঞান নাই—সকলে গলাগলি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করিতেছে এবং আনন্দে নৃত্য ও গান করিতেছে। কুরুক্ষেত্র সমরের অভিনয় পূর্ব্বে অন্তর্বিগ্রহের বাণিজ্যে যে ক্ষেত্র মরুময় হইয়া গিয়াছিল, আজ সেই ক্ষেত্র মহারত্নাকরে পরিণত! প্রেম ও শান্তি আসিয়া আজ তথায় আপন আপন আসন বিস্তার করিয়াছে। সমগ্র প্রভাস আজ যেন কৃষ্ণপ্রেম-বিপণিমালায় সজ্জিত!

বিহ্বল বিক্রেতা গাহে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম-ক্রেতা গাইছে বিহ্বল,
পণ্য কৃষ্ণনাম, মূল্য কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যেন বাণিজ্য সম্বল !

নরনারায়ণ দেখিলেন জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রশস্ত পথ বাহিয়া সমগ্র ভারত আজ প্রভাসে কৃষ্ণপ্রেমার্ণবে ভাসমান। বুঝিলেন—শৈলজা ও সুভদ্রার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ অনার্য্য ও আর্য্যের সম্মিলনরূপ প্রেম-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রেমাশ্রুপ্লাবিত নেত্রে বসন্তের নীলাকাশ পানে স্থির, অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যোগস্থের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

এমনই পবিত্র মুহূর্ত্তে, শৈলজা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আকুল উচ্ছ্বাসে কহিল—

"দেখ নরনাথ ! দেখ নারায়ণ !
আর্য্য-অনার্য্যের প্রেম-সম্মিলন।
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
তব প্রেমস্রোতে গিয়াছে ভাসি ;
দেখ ধর্ম্মরাজ্য ! প্রেমরাজ্য তব !
কি প্রেম ! কি শান্তি ! অমৃত রাশি।"

নরনারায়ণ প্রেমোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"এ যে প্রেমরাজ্য ভদ্রা-শৈলজার।
শৈল, আজি মম পূর্ণ মনস্কাম।"

* * *

আজি চতুর্ভুজ মুরতি আমার,
গদা পার্থবল, শঙ্খ গীতা আর,

সুভদ্রার বক্ষঃ শান্তি-শতদল,
প্রেম-মধুচক্র বক্ষঃ শৈলজার।
পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত,
পূর্ণ দ্বাপরের নিয়তি কঠোর,
অধর্ম্মের কৃষ্ণপক্ষ ঘোরতর
হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর।
আত্মবলিদান দিয়া অভিমন্যু
যেই শুক্লপক্ষ করিল সঞ্চার,
পবিত্র প্রভাসে হইল উদিত
সুশীতল পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার।

শৈলজা কাতরকণ্ঠে কহিল—

"প্রাণনাথ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস—
* * * এই শৈলজার,
প্রেম-বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল
লও শান্তি-সিন্ধুপদে পুরাও বাসনা!"

এই "উদ্বেল প্রবাহ" কিসের শুনিবেন? শৈল শুনিয়া আসিয়াছে--

"সমাপ্ত উৎসব।

কৃষ্ণের আদেশ—যাত্রী যাবে রজনীতে
পঞ্চক্রোশ; আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন!"

সে দেখিয়া আসিয়াছে ইহারই মধ্যে নৃত্যশীল, ঊর্দ্ধবাহু ভক্তবৃন্দ বজ্রাহতের ন্যায় নিস্কম্প, নীরব দাঁড়াইয়া আছে! লীলা-গীত অর্দ্ধতানে থামিয়াছে—বাদ্য অর্দ্ধতালে বিনীরব হইয়াছে! উৎসব-সিন্ধু-কল্লোল

ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে। সমবেত জনসঙ্ঘ তাহাকে ও সুভদ্রাকে উদ্দেশ করিয়া বিষণ্ণ, শুষ্ক কণ্ঠে কহিয়াছে—

"মাগো! তোরা দুইজন,
এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
লয়ে চল বৃন্দাবনে; দেখা গোপালের
সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাবনী।
অবগাহি যমুনার সুশীতল নীরে,
আলিঙ্গিয়া সুশীতল কদম্ব-তমাল,
কৃষ্ণপদে পবিত্রিত শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত সুশীতল—
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম-পিপাসা
যুড়াইব প্রাণ মা গো! বড়ই আকুল।"

তাই আজ শৈল আকুল প্রাণে নরনারায়ণের চরণপ্রান্তে হৃদয়ের আকুলতা দূর করিতে আসিয়াছে।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল—

"প্রাণনাথ! দীনবন্ধো! তুমি দয়াময়!
করুণার সিন্ধু তুমি। কেন এইরূপে
ভাঙ্গিলে উৎসব নাথ! দিলে ব্যথা প্রাণে
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে?"

নারায়ণ শৈলজার শিরে দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া স্নেহকণ্ঠে কহিলেন—"বুঝিবে"। শৈল সেই সদাপ্রসন্ন, উজ্জ্বল মুখপানে কাতরভাবে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—

"——————পতিতপাবন!
সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে!

আর্য্য ও অনার্য্য নাথ! দুই মহাস্রোত
এ প্রেম-প্রবাহে আজি হইয়া পতিত
সলিলে সলিল যেন হইয়া বিলীন,
ছুটিল কি সিন্ধুমুখে শান্তি-পারাবার!

কিন্তু, এ পতিত শৈলজার স্বজাতি কেবল
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি
হইলে নিদয় কেন? কেন নিবারিলে
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত গণে?
শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
রহিল পতিত নাথ! রহিল পতিত
শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি,
জরৎকারু, মাতা-কন্যা-ভগ্নী শৈলজার?

* * * *

আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল
জ্বলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে
মহা বাড়বাগ্নি সম! দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়?"

নরনারায়ণ আবার প্রসন্নমুখে সস্নেহে কহিলেন—"বুঝিবে শৈল।" শৈল বিস্ময়বিহ্বল নয়নে সেই শান্ত চন্দ্রালোকে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। দেখিল তাঁহার আঁখিযুগল যেন এক অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছাসে ছল ছল করিতেছে! নারায়ণ কোমল কণ্ঠে কহিলেন—

"বাসুকি ও জরৎকারু !—ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল ! এই ধরাতলে।"

শৈল শুনিল—এতদিনে এতদূরে এই যুগলনাম নারায়ণের প্রেমোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হইতে শুনিল। আশৈশব ত সে এই নাম শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু এমন মধুর কণ্ঠে ত কেহ কখন তাহাদের নামোচ্চারণ করে নাই! এ যে ভগবানের কণ্ঠে ভক্তের নাম—এ নাম মধুর শুনাইবে না! কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"ভগবন্! তব মুখে বড়ই মধুর
ভক্তনাম!—ভক্ত তব, ভক্তের সে তুমি!"

কিন্তু শুনিলে কি হইবে? এ শোনায় তাহার কাণ তৃপ্ত হইল বটে কিন্তু প্রাণ শান্ত হইল কই?

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

প্রাণনাথ! লীলাময়! একি লীলা তব!
বাসুকি ও জরৎকারু ভক্ত তব যদি
কেন তাহাদের এই অশান্তি অনলে
পোড়াইলে হায় নাথ! একটি জীবন?
চল নাথ! চল যাই পতিত পাতালে!
নাগপুর হবে তব নব ব্রজপুর;
বাসুকি, শ্রীদাম সখা; শৈল, জরৎকারু—
হায়! নাথ! জরৎকারু মহা মরুভূমি,
চির-প্রেম-পিপাসিনী, চির-উন্মাদিনী!—
হইবে ব্রজের গোপী; বহিবে যমুনা
সিন্ধুনদে, সিন্ধুমুখে গাইয়া গাইয়া
পতিতপাবন নাম; সাগর-সঙ্গমে
হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত অসীম!

হইল উদ্ধার নাথ! অহল্যার মত
পতিতা অনার্য্যা ভূমি; হইল উর্ব্বর
উষর অনার্য্যা ভূমি; হইল শোভিত
মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম-সরোবর।
তব কৃপা-জাহ্নবীর প্রবাহে শীতল;
কেবল কি নাগভূমি রবে মরুময়?
কেবল কি নাগপতি, কারু কি কেবল
হৃদয়ে বহিবে মরু? নিবিবে না হায়!
কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা?

নারায়ণ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

"নিবিবে—নিবিবে শৈল!
পূর্ণকাল—পূর্ণব্রত;—পূর্ণ মনোরথ!"

অকস্মাৎ উৎসবধ্বনিমুখরিত যাদবশিবিরে ঘোর হাহাকার রব উত্থিত হইল! দূরাগত মহাঝটিকার মত সেই ভীষণ হাহাকার ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল! শৈলের বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দারুক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া, নারায়ণের পদতলে পড়িয়া কাতরস্বরে কহিল—

"উন্মত্ত সুরায়
সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা নিন্দি পরস্পরে,
সাত্যকির খড়্গাঘাতে হইয়াছে হত
কৃতবর্ম্মা। জ্বলিয়াছে হায়! ঘোরতর
অন্তরবিগ্রহানল। উন্মত্ত সুরায়,
যদুকুল, সে অনলে মরিছে পুড়িয়া
আঘাতিয়া পরস্পরে—রক্ষ যদুকুল!"

নারায়ণ দারুক ও শৈলজা সহ বেগে ছুটিয়া গেলেন। কি দেখিলেন?

দেখিলেন———

"————————দাবানল মাঝে
পতঙ্গ পালের মত মরিছে পুড়িয়া
যদুকুল, আঘাতিয়া হায়! পরস্পরে
দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে, হইয়া আহত
নাহি জ্ঞান! আত্মদ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব
গুপ্ত শত্রু আক্রমণ! কি দৃশ্য ভীষণ!

* * * * *

নাহি অস্ত্র সকলের
তীরজাত এরকায়, মুষলে, মুষলে,
প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত,
নাহি জ্ঞান গুপ্তশরে, নহে এরকায়।"

নারায়ণ স্থিরনেত্রে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ শোক-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন———

* * * * ক্রমে ক্রমে হত
হইল যাদবকুল, স্নেহের আধার
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী, মহারথী
ভারতের অদ্বিতীয়, হইল নিহত
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার—
রৈবতক শৃঙ্গ-মালা পড়িল ভাঙ্গিয়া
একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে!

দেখিতে দেখিতে যদুকুল নির্ম্মূল হইল! সেই ভীষণ বিপ্লবানল ধীরে ধীরে প্রশমিত হইল।

নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
আত্মঘাতী যদুকুল। ধীরে ধীরে মহা
শ্মশান অনল মত শিবির অনল
নিবিল—নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ!

বিপ্লব নিবিল বটে—কিন্তু প্রভাসের উৎসব-ক্ষেত্র আঁখির পলকে শবক্ষেত্রে পরিণত হইল! প্রভাসের শান্তি-পারাবার যাদবের শোক-পারাবারে রূপান্তরিত হইল। দারুক এই শোক দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না—সে নারায়ণের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল———

"এই কি করিলে হরি!"

স্থির অবিচলিত কণ্ঠে নারায়ণ উত্তর করিলেন——

"* * * * দারুক! দারুক!
যাদবের কুরুক্ষেত্র হ'য়েছে সাধিত!
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত।
যুগশেষ!—**লীলা শেষ!**"

এ কি কণ্ঠ! এ কি গীতি! দারুক শুনিল ধরাতলে সেই মহাধ্বনি প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে! সুনীল মহাসিন্ধু ভীমভৈরব গর্জ্জনে হুঙ্কারিয়া উঠিল—"**লীলা শেষ!**" নীলাভ আকাশপটে বালারুণ রেখায় অঙ্কিত হইল—"**লীলা-শেষ!**" দুষ্কৃতের মহাশ্মশান প্রভাস প্রতিধ্বনিত করিয়া রব

উঠিল—"লীলা শেষ!" দারুক আত্মবিস্মৃতের ন্যায় শ্রীহরির পাদপদ্মে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শৈলও এই করুণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া নারায়ণের চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল, সহসা নারায়ণ তাঁহাকে আপনার ত্রিদিববাঞ্ছিত বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। শৈলের জীবন-ব্যাপী তপস্যা ও কোমলকঠোর ব্রত পূর্ণ হইল।

কৃষ্ণগতপ্রাণা কারু এদিকে কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রভাসের সর্ব্বত্র উন্মাদিনীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পথ পর্য্যটনে তাহারি কোমল পদপল্লব ক্ষত-বিক্ষত; তথাপি তাহার চলার বিরাম নাই। নয়নে ধারার বিরাম নাই—উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভারে অন্তর আকুল; তবুও কৃষ্ণবিরহিনী কৃষ্ণ-দরশন-আশায় প্রভাসের বেলাভূমিতে ঘুরিতেছে। সে দেখিল———

ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত পারাবার
গর্জ্জিতেছে প্রভাসের ঘোরাল ধূম্রল;
আবরিত বেলা ভূমি ধূম্র ভস্ম আবরণে,
আবরিত চরাচর নিস্তব্ধ নিশ্চল!

* * * * *

রহিয়া রহিয়া ধরা কাঁপিতেছে মৃদু গুরু,
প্রকম্পন অবিরল, অথবা বিরল,
যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া দোলা,
কভু ঘন, বহুক্ষণ কখনও নিশ্চল।
মহাশক্তি ধূমাবতী গরজি জলধি মন্দ্রে
রহিয়া রহিয়া নৃত্য করিতেছে ভীমা,
ধ্বংশ করি দিবাকর, ধ্বংশ করি চরাচর,
ক্ষুদ্র বেলাখণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা!

তাহার মনে হইল বসুধায় কি যেন একটা যুগান্তকারী ঘটনা আসন্ন ; তাই প্রকৃতির এই আলোড়ন বিলোড়ন চলিয়াছে! এই যুগশেষে মানবের ইতিহাস যেন আবার নূতন করিয়া রচিতে হইবে বলিয়াই এই ওলট পালট ঘটিতেছে! মনে করিতেও রমণীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল ; বুকের বেদনা বুকে চাপিয়া সে একটা শিলাখণ্ড আশ্রয় করিয়া অবসন্ন দেহে শুইয়া পড়িল। সহসা কাহার যেন অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। পাগলিনী চক্ষু চাহিয়া দেখিল সহোদর বাসুকি তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সে ছুটিয়া গিয়া বাসুকির স্নেহ-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং কৃষ্ণের সন্ধান মিলিয়াছে কি না প্রশ্ন করিল। বাসুকি তাহাকে সুসংবাদে আশ্বস্ত করিলে রমণী নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—

"পেয়েছ! কোথায় তিনি? কেমন আছেন কহ?
আছেন ত নিরাপদে?"

বাসুকি উত্তর করিল— "বিপদ তাহায়
পারে কি ছুঁইতে?"

তার পর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল—

"পেয়েছি দর্শন তাঁরু!—বহু অন্বেষণ পরে
রজতের মহামূর্ত্তি দূর সিন্ধুতীরে ;
দেখিনু উপলাসনে উপলে রখিয়া পৃষ্ঠ
কি মহিমা মহাবক্ষে সমুন্নত শিরে!
অঙ্গ অবিচল স্থির, নিমীলিত দুনয়ন,
কিবা সুপ্তসিংহ-শোভা নিদ্রিত গৌরব,

শৌর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের মূরতি নীরব !
ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেঘছায়া মত
পড়িয়াছে শোকছায়া বদনে গভীর !
কপোলে গভীরাঙ্কিত শুষ্ক অশ্রুনীর।

* * * *

হিমাদ্রির পাদমূল বিলোড়িত ঝটিকায়—
সানুদেশে চিরশান্তি অবিচল স্থির ;
ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্ম্মূলিত যদুকুল—
যদুনাথ শান্ত, স্থির, মূরতি গম্ভীর,
মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুনীর !”

আর সেই সময় অগণিত নাগসৈন্য তাঁহার অন্বেষণে গিয়া তাঁহাকে দেখিবা মাত্র “জয় নাগরাজ” বলিয়া যেমন নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবে, অমনি তিনি সৈন্যপানে স্থিরনেত্রে চাহিয়া দক্ষিণ কর প্রসারণ পূর্ব্বক “তিষ্ঠ” বলিতেই কেমন সেই উত্তোলিত শত শত অসি চক্ষুর নিমেষে অচল হইয়া গেল, তাহা জানাইল। তার পর নারায়ণ—

“বাসুকির কার্য্য শেষ।
বৎসগণ ! তোমাদের নব কার্য্যস্থল
সিন্ধুর অপর পারে সুন্দর শীতল।
শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া সিন্ধুমুখে, কর তাঁর অনুসার
গাহি আর্য্য-অনার্য্যের গীত সম্মিলন।—”

এই কথা বলিতেই কেমন প্রাচীরের ন্যায় সজ্জিত সেই সৈন্যনিচয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”

গাহিতে গাহিতে হলায়ুধ বলরামের অনুসরণ করিয়া ছুটিল, তাহাও শুনাইল।

আর বলিল—"কারুরে!

কি মূর্ত্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে,
কপোলে যুগল ধারা, করুণা-শীতল!
মূর্ত্তি নর-নারায়ণ! চাহিনু পড়িতে পদে
ছুটিয়া—চরণ হায়! হইল অচল!
হায়! মহাপাপী আমি! ঘুরিল মস্তক মম,
কি মাদকে দেহ মন হইল পূরিত,
পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্চ্ছিত!
অন্তে হায়! আর, সেই মূর্ত্তি মহিমার
নাহি দেখিলাম, হায়! দেখিব কি আর?
দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকার?
দেখিব কি? দেখিতেছি—দেখিতেছি নিরন্তর,

* * * *

এই দেখ সেই রূপ! চল কারু! চল যাই
পড়ি গিয়া দুই জনে চরণে তাহার!"

নাগরাজ বাসুকি উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া যাইতে কারু তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তার পর স্থিরকণ্ঠে কহিল—

"দাদা! ভ্রান্তি কর পরিহার!
আমাদের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ!
যেই আশা-বৃক্ষমূলে সেচিলাম জল
আজীবন, ফলিয়াছে আজি তার ফল।
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল, যদুকুল প্রভাসেতে
করিয়াছে আত্মহত্যা। হইল উদ্ধার,

এতদিনে নাগরাজ্য, সাম্রাজ্য তোমার।
পূর্ণ জীবনের ব্রত! পরিপূর্ণ মনোরথ!
চল যাই নাগপুরে বসাব তোমায়
সিংহাসনে, পরাইব মুকুট মাথায়।
জীবনের আশা-স্বপ্ন করি চরিতার্থ সুখে
ভারতে অনার্য্য-রাজ্য করিব প্রচার—
পাবে কারু এতদিনে সীমা আকাঙ্ক্ষার।"

এই কি কারুর আশা-স্বপ্ন—ইহাই কি তাহার আকাঙ্ক্ষার সীমা? অথবা নাগরাজের আকাঙ্ক্ষার সীমা ও রহস্য নির্ণয়ের নিমিত্ত কারুর এই আশ্বাস-বাণী? বাহ্যদৃষ্টিতে ইহাই কারুর আশা আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ বলিয়া অনুমিত হয় বটে; কিন্তু পাঠকগণ একটু পরেই বুঝিতে পারিবেন যে তাহার কৃষ্ণবিদ্বেষী ভ্রাতা নাগরাজের হৃদয়ে কৃষ্ণবিদ্বেষ সম্পূর্ণ পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে কি না তাহাই জানিবার নিমিত্ত ইহা ভগিনীর বাকচাতুর্য্য মাত্র! কৃষ্ণ-প্রেমকাতরা কারুর অন্তরের সকল সাধ আশা ত সেই শ্রীকৃষ্ণে গিয়া মিলিয়াছে; সুতরাং সে কি আর অনার্য্য-রাজ্য-বিস্তাররূপ তুচ্ছ কামনায় মুগ্ধ হইতে পারে?

তাই বাসুকি যখন উত্তরে কহিল—

"কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে
অনার্য্যের যেই রাজ্য হয়েছে স্থাপিত;—
তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল!
আমরা বনের পশু, কোথা পাব হেন রাজ্য?
কোথা পাব সেই জ্ঞান সে প্রেম অতুল?
কারুরে! এখন তোর গেল না কি ভুল?
রাতুল চরণদ্বয়, সে রাজ্য মহিমাময়,

চল যাই, সেই রাজ্য করি অধিকার ;
এমন সন্তাপহর রাজ্য এই ধরাতলে
আমরা পতিত নাহি পাইব রে আর !”

কারু ভ্রাতার অশ্রুসজল আঁখি দেখিয়া আপনার অন্তর-রোদন বহুকষ্টে নিবারণ করিয়া কহিল—

”ভুলিলে কি দাদা ! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার !”

বাসুকি আর স্থির থাকিতে পারিল না ; বিস্ময়োচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

শত্রু কৃষ্ণ ! না না, কারু ! হায় ! এ জীবনে আমি
ভাবি নাই শত্রু কৃষ্ণ—ভাবিব কেমনে ?
পিতার রক্ষিত শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু,
রণে, বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে।
দেখিয়াছি আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ—
পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ শিরে।
শুনিয়াছি দেবকণ্ঠ নর-করুণার গীত,
বনের পাষাণ আমি ভাসি অশ্রুনীরে।
করিয়াছি আলিঙ্গন দেব-দেহ লীলাময়—
কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল !
বৃন্দাবনে, নাগপুরে, যমুনায়, সিন্ধুবক্ষে,
করিয়াছি কত ক্রীড়া আনন্দ বিহ্বল !
রাখি মুখ অঙ্কে মম ঘুমাইত শিশু মত,
আমি জননীর মত দেখিতাম মুখ ;
কভু গলা জড়াইয়া অংসে মম রাখি মুখ,
সখ্য প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক।
কখনও নীলাব্জ নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে

দেখিত, কহিত ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য-স্বপন ;
যাহার ছায়ায় আর্য্য-অনার্য্যের এই স্বর্গ,
কালি করিলাম স্বর্গ প্রভাসে দর্শন ।

* * *

দেখিলাম দ্বৈপায়ন আশ্রমে সে দেব-রূপ,
দেখিলাম কালি আর্য্য-অনার্য্য উৎসবে ;
দেখিলাম আজি আর্য্য-অনার্য্যের মহাযাত্রা,
দেব-নেত্রে প্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে ।
চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে,
পাপী আমি চলিল না চরণ আমার ।
শক্র মম দুরাচার সেই জরৎকারু ঋষি

* * *

অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই দুরাচার ।
ঋষিকুলে ধূমকেতু ; জ্বলিল বনের পশু
এইরূপে ! প্রতিশোধ লইব তাহার—
নারায়ণ !—প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার !”

ক্ষুব্ধ শার্দ্দুলের মত বাসুকি ক্রোধে ছুটিয়া গিয়া কোথায় মিলিয়া গেল ! কারু সহোদরের এই সরল ভাবোচ্ছ্বাসে তাহার অন্তরের অন্তর অবধি দেখিতে পাইল । সে শিলাখণ্ডে মুখ রাখিয়া নয়ন আসারে ভাসিতে লাগিল । অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সে ভাবিতে লাগিল—এমন আনন্দের দিনেও তাহার অন্তর আজ বিষাদে ভরিয়া উঠিতেছে কেন ? তাহার জীবনে দুর্ব্বাসা যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার মোহন স্বপ্ন ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ত আজ পূর্ণ ও সফল হইয়াছে—ক্ষত্রিয় জাতি ত তাঁহার কৌশলে আত্মঘাতী হইয়া সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে ! চিরনিপীড়িত অনার্য্য জাতি ত

ভারতে আপন অধিকার বিস্তার করিয়া অনার্য্য-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তবুও তাহার হৃদয় আজ এ কি অজ্ঞাত, অতৃপ্ত কামনার উচ্ছ্বাসে উদ্বেল? এ সাধ বা আকাঙ্ক্ষা কি তবে তাহার নিজস্ব নহে? অনার্য্য-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও কি তবে তাহার কাম্য ছিল না? রমণী অন্তরের তল অবধি খুঁজিয়া এই দুঃসহ বেদনার কারণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইল। একবার মনে হইল, তাহার অপূর্ণ প্রেমের নিরাশাই হয় ত তাহার সকল অশান্তির কারণ হইবে; কিন্তু তখনই ভাবিয়া দেখিল, সে প্রেমের নিরাশা ত তাহার জীবনের সম্বল—তাহা ত নূতন নহে; দুর্ব্বাসার ছল-পত্নী হওয়ায় তাহার এ সাধে ত অদৃষ্ট চিরদিনের জন্য বাদ সাধিয়াছে। তবে আজ তাহার এ উচ্ছ্বাস কিসের? রমণী ব্যাকুল ভাবে তাহার অন্তর অনুসন্ধান করিয়া বুঝিল প্রেমেরই নিরাশা তাহার মনোবেদনার কারণ বটে, তবে সে প্রেমের লক্ষ্য দুর্ব্বাসা নহে—সে প্রেমের লক্ষ্য তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব-ধন পতিতপাবন নারায়ণ। তাহার অভিশপ্ত নারীজীবনে সে যে তিল তিল করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাঁহারই শ্রীচরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে! তাঁহারই ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা যে আজ তাহার নিরাশা-মথিত জীবনের নর্ম্ম সহচরী! ভ্রাতার মুখে সেই চিরবাঞ্ছিতের কুশল সংবাদ পাইলেও সে যে আজ তাঁহার দর্শন লালসায় কাতরা ও ম্রিয়মানা। হায়! চিরবিরহিণী নারীর এ প্রেম-পিপাসা কি প্রেমময় পূরাইবেন না? কান্ত বাঞ্ছিতের উদ্দেশে কাতর ভাবে কহিল—

"শুনিয়াছি আজীবন, শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে—
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি—তুমি মম জীবন, মরণ!

তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল !
তুমি মম চিরসুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল !
ধরার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, ধরার আলোক শ্রেষ্ঠ,
সুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাসা যাহার—
সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিন্ধু বক্ষে,
বিসর্জ্জিবে এই ঘোর জীবন তাহার ?
নিরখিয়া সে সৌন্দর্য্য, নিরখিয়া সে আলোক,
নাথ ! নেই রূপ-সুধা নেত্রে করি পান,
জীবন সৌন্দর্য্যময়, জীবন আলোকময়,
জীবন সে সুধাময়, করিবে প্রদান—
সুধাময়ে সুধা—পূর্ণ কর মনস্কাম।"

কারুণ্য হৃদয়ের অনল দাউ দাউ করিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল। উচ্ছসিত হৃদয়ে উন্মাদিনী সে অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল। কিয়ৎদূর গিয়া দেখিল—একটী বৃহৎ নিম্ববৃক্ষমূলে ঘন ছায়ান্ধকার অপসারিত করিয়া এক মহিমাময় মূর্ত্তি নিমীলিতনেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট।

"অবলম্বি মহাবৃক্ষ সমুন্নত মহাবপু,
প্রসন্ন বদন, দেহ অচঞ্চল স্থির,
স্থাপিত মূরতি যেন মহা সমাধির !
যোগীবেশ রাজর্ষির, নিমজ্জিত মহাধ্যানে ;
পশ্চাতে ধূম্রল ব্যোম শোভে মহাপট,
পদতলে মহাবেদী শোভে সিন্ধুতট।
নীরব, নিস্পন্দ ঘোর স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর
কেবল অনন্ত সিন্ধু মহা স্তুতি-গীত

গাইতেছে মহাকণ্ঠে গাম্ভীর্য্য পূরিত।"

কারু সতৃষ্ণ নয়নে একবার সেই মূর্ত্তি পানে চাহিয়া দেখিল, দেবাদিদেব মহাদেব যোগাসনে বিরাজমান; কিন্তু পরক্ষণেই চাহিবামাত্র যেন সে মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া গেল! সে দেখিল নাগপুরে সরোবরতটে মৃগয়ার বেশে সজ্জিত এক কিশোর বালক সমাসীন; আর,

"কি সৌন্দর্য্য! কি মহিমা! কিবা বীর্য্য! কি গরিমা!
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেহ নবীন নিথর।
নবীন নীরদ অঙ্গে, প্রতিভা বিদ্যুৎ রঙ্গে
খেলিতেছে কি তরঙ্গ-লীলা করুণার!"

কিশোরী কারুর প্রাণে এই মনোমুগ্ধকর মদনমোহন রূপ অতীতের এক সুখ-স্বপ্নের সঞ্চার করিল। হায়! বাপীতটে, উপবনে নদীবক্ষে, গৃহকক্ষে, কখন বা কাননের অঙ্কে অঙ্কে সে, যে এই স্বপ্ন-নাটক অভিনয় করিয়াছে। এই স্বপ্ন-নাটকের অঙ্কে অঙ্কে একদিন যে তাহার অদৃষ্টে কত সৌভাগ্য, কত অমৃতের উৎস উথলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়! সেই শেষ অঙ্কের কথা স্মরণ হইলে এখনও যে তাহার ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। শেষ কি না সে অপমানিতা, প্রত্যাখ্যাতা হইল! তাহার সারা জীবন মরুময় করিয়া—তাহাকে নিরাশার বাড়বানলে ভস্মীভূত করিয়া তাহার অন্তর-নিধি চলিয়া গেল! দুঃখে, অভিমানে সে আপন বক্ষে শরাঘাত করিল। সহসা কার করুণাপ্লাবিত কণ্ঠস্বর কারুর কর্ণে আসিয়া সুধা-ধারা ঢালিয়া দিল। সে শুনিল, তাহারই নাম ধরিয়া সেই কণ্ঠ যেন বলিতেছে—'

"পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি !
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তিধাম !"

রমণী ব্যাকুল ভাবে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার চির ঈপ্সিত মদনমোহন নারায়ণ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ! চারি চক্ষুর মিলন মাত্র উন্মাদিনী রমণী "প্রাণনাথ" বলিয়া কাঁদিয়া প্রেমময় নরনারায়ণের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রেমিকার প্রেম পরিতৃপ্তি লাভ করিল—মনস্কাম পূর্ণ হইল। সে দেখিল—

"প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা,
প্রেমামৃতে ভাসিতেছে বিশ্ব চরাচর ;
উঠিতেছে কি সৌরভ ! কি স্বর্গ সুন্দর !"

এমন সময়, বাঞ্ছিতের এহেন প্রাণারাম উরস-স্বর্গে প্রেমপিপাসাতুরা কোন্ রমণী না চিরতরে ঘুমাইয়া পড়িতে চাহে ? কারু মুগ্ধ প্রাণে প্রেমময়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া প্রেমামৃত পান করিতে করিতে ধীরে ধীরে চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিল ! বীণা পূর্ণতান হইল !

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

"কারু ! কারু ! কি করিলি !" কাঁদি উচ্চে নাগরাজ
দূর হতে নিরখিয়া আসিল ছুটিয়া,
"কারু ! কারু ! কি করিলি, হায় ! কি করিলে হরি !"
পড়িলা চরণ তলে মূর্চ্ছিত হইয়া।"

মূর্চ্ছাভঙ্গে বাসুকি শোকে উন্মত্ত হইয়া কারুর বক্ষঃবিদ্ধ শর উৎপাটন পূর্ব্বক আপন বক্ষে হানিয়া পুনর্ব্বার হানিতে যাইতেছে, এমন সময় প্রেমময় নারায়ণ সেই শর বেগে কাড়িয়া লইয়া মহাসিন্ধু গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। বাসুকি শোকে প্রেমে অধীর হইয়া নারা-

য়ণের ক্ষত বিক্ষত পাদপদ্ম আপনার ক্ষত বুকে ধারণ করিয়া শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

"হায় ! কি করিলে হরি !—ক্ষম মুগ্ধ বালিকায় !"

নারায়ণের কণ্ঠে তখনও কারুর দেহলতাখানি কৌস্তুভের মালার ন্যায় জড়াইয়া আছে ; তিনি বাম করে তাহার দেহলতাখানি ধরিয়া দক্ষিণ কর নাগরাজের শিরে স্থাপন করতঃ প্রেমাশ্রুবিগলিতকণ্ঠে প্রসন্ন বদনে কহিলেন—

"নাগরাজ ! বৃথা শোক কর পরিহার !
যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব-ভাবে মানব করে মম অনুসার ।
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন, চাহিয়াছ শত্রু ভাবে,
পাইয়াছ শত্রু ভাবে আজি দুই জন ;
আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপন ।"

বাসুকি কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

"————হায় ! হরি দুই জন
কেন হইলাম শত্রু, চরণ-কণ্টক ?
করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক ?
মানব যে পাদপদ্ম পূজিয়াছে, পূজিতেছে,
পূজিবে অনন্তকাল পুষ্পে সুকোমল ;
মানব যে হরিনাম আনন্দে করিয়া গান,
করিয়াছে, করিতেছে প্রাণ সুশীতল ;
আমরা সে পাদপদ্ম পূজি নাই একদিন,
গাই নাই একদিন সেই হরিনাম,
আমরা সে পদাম্বুজে করিলাম হায় ! নাথ !—

এই দেখ বাসুকির ফাটিতেছে প্রাণ—
আমরা তোমাকে শত্রু কেন ভাবিলাম ?”

যোগস্থ নারায়ণ স্মিতমুখে উত্তর করিলেন—

“ইহাও আমার লীলা !”

বাসুকির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! সে কাতর ভাবে কহিল—

“————হায় ! এ কি লীলা হরি !
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনে করিলাম সমর্পণ
যৌবন-প্রভাতে এই দুইটী জীবন,
নারায়ণ ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ ?
এই বনফুলে স্থান, কেন করিলে না দান ?
হায় ! অকরুণ হরি !—ক্ষুদ্র দুর্ব্বাদল
পায় স্থান তব পদে—পতিতপাবন তুমি !—
পাইল না কেন কারু, বাসুকি কেবল ?
কারু, বাসুকিরে হায় ! না করিলে শত্রু তব,
বনের পতঙ্গ নাহি করিলে দাহিত,
দাবানলে ধর্ম্মরাজ্য হ'ত না স্থাপিত ?”

যোগস্থ নারায়ণ ঈষৎ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

“নাগরাজ ! শত্রু মিত্র কে বল কাহার ?
আমি জগতের, এই জগত আমার !
ওই দেখ পারাবার—কি মহাশক্তির ক্রীড়া !
কি শক্তিতে মহাসিন্ধু দেখ বিধূনিত !
ওই দেখ কি তরঙ্গ ! দেখ কি তরঙ্গ-ভঙ্গ !
কি তরঙ্গে তটভূমি আহত কম্পিত,
করি সংঘর্ষণে ফেনপুঞ্জ উদ্গীরিত !

জলরাশি মুহূর্ত্তেক না পারে থাকিতে স্থির
স্রোতবলে—স্রোত তবে শত্রু কি তাহার ?
তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, তটভূমে প্রতিঘাত—
ঊর্ম্মির কি শত্রু ঊর্ম্মি, শত্রু কি বেলার ?
এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া,
এই ঘাত প্রতিঘাতে হতেছে সৃজিত
পলে পলে বসুন্ধরা, হইতেছে পলে পলে
প্রবাল মুকুতা রাশি সৃজিত বর্দ্ধিত !
এই ঘাত প্রতিঘাত চেতন জগতে আছে,
মানব-জগতে আছে এ ক্রীড়া আমার,
এই ঘাত প্রতিঘাত,—প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র !
এ নহে তোমার ক্রীড়া,—নহে দুর্ব্বাসার।
মানব-মঙ্গল-তটে অধর্ম্ম তরঙ্গায়িত—
পতিত ক্ষত্রিয় জাতি—হইয়া প্রহত,
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে হত !
এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি মঙ্গল
দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত !
দুর্ব্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্য্য অনার্য্যের সন্ধি—
আমার নীতির ক্রীড়া, নহে দুর্ব্বাসার ;
তুমি ও দুর্ব্বাসা মাত্র নিমিত্ত তাহার।
আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,
শক্তির নীতির মম মহা আবর্ত্তন !
এই আবর্ত্তন—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন।"

বাসুকি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে নারায়ণের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—

"দেখিতে, ধরিতে মূর্ত্তি নহে পারে নর-নেত্র
নাহি পারে সেই কথা করিতে ধারণ!
সে মূর্ত্তি অনন্ত, ভাষা—অনন্ত-নিস্বন!"

বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে সে কেবল প্রশ্ন করিল—

"জগন্নাথ!
অনন্ত শকতি তব; তবে কেন হায়!
ভ্রাতাভগ্নী দুইজনে এ লীলা-শিখায়,
পোড়াইলে অকরুণ? দাস, অনুদাস কভু
রাখিলে না কেন নাথ! চরণ-ছায়ায়?"

নারায়ণ প্রশান্ত বদনে মহাসিন্ধু পানে চাহিয়া কহিলেন—

"—————— ————নরজন্ম নরদেহ,
যুগে যুগে, এইরূপে করিয়া গ্রহণ,
সহি কত কুরুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি,
সহি আমি কত নর-দুঃখ নিরমম!
কে আমার সুখী বল?—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র?
সুখী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ?
আমার বাসুকি কারু, কেমন হইবে সুখী?
কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম?
মানব অধর্ম্ম ফলে, জলে যেই দুঃখানলে,
জ্বলি সেই দুঃখানলে সহ নিজগণ,
না করিলে ধর্ম্মরাজ্য ভূতলে স্থাপন;
আদর্শ দর্পণ মত না ধরিলে নরচক্ষে,
দেখিতে, বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ

ক্ষুদ্র নর ; নাহি হয় উদ্ধার সাধন !
এইরূপে যুগে যুগে, সহিত স্বগণ মম,
কেহ শত্রু, কেহ মিত্র—লভিয়া জনম,
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
সাধি আমি, করি ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন।
ত্রেতার রাবণ, আর দ্বাপরের দুর্য্যোধন,
দুর্ব্বাসা, বাসুকি,—অঙ্গ একই লীলার ;
ত্রেতার সে শূর্পণখা, দ্বাপরের জরৎকারু,
রূপে মুগ্ধা ভকতির প্রতিমা আমার !”

তার পর প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে বাসুকিকে বক্ষে টানিয়া কহিলেন—

“এস সখে ! এস বুকে ! বড়ই কাতর প্রাণ
তব প্রেম পিপাসায়—গাও হরিনাম !
এস বুকে ! আমাদের লীলা অবসান।”

বাসুকির নয়নের অবিরল ধারায় নারায়ণের বক্ষঃ সিক্ত হইতে লাগিল। সে সেই প্রেমময়ের বক্ষে মুখ রাখিয়া প্রেমানন্দে দরদরনেত্রে তাঁহার মুখ দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কয়েকবার ডাকিল—কারু ! কারু ! কারু ! জলস্থল বিকম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল—“কারু ! কারু ! কারু !” ; কিন্তু সে ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি কিছুই কারুর কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না ! কারু কোথায়—যে সে উত্তর দিবে ! নাগরাজ বুঝিলেন, প্রেমবিন্দু—প্রেমানন্দে প্রেমসিন্ধুবক্ষে স্থানলাভ করিয়াছে ! প্রেমাবেশে সে নারায়ণের চরণপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িল !

* * * *

এদিকে অর্জ্জুন ও সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অধীর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে প্রভাসে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, প্রভাসের উৎসব-ক্ষেত্র শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

"ভস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত!
বিলাসের ভগ্ন, দগ্ধ, উপকরণের রাশি
আছে পড়ি শব সহ; এখনো রয়েছে বাসি
বিলাস-কুসুম-দাম যাদবের যাদবীর
অঙ্গে অঙ্গে ভস্মাবৃত; করে পান-পাত্র স্থির
এখনো রয়েছে কারো; রয়েছে বিলাস-বেশ
ভস্মাবৃত; ভস্মাবৃত বেণীবদ্ধ চারু কেশ।

* * * *

পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে;
বক্ষে মৃতা প্রণয়িণী, প্রণয়ী পড়িয়া আছে!"

সেই করুণ, মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া দম্পতীযুগলের শোক উথলিয়া উঠিল। অর্জ্জুন সাশ্রুনয়নে করযোড়ে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিলেন—

"এ কি লীলা হরি! তুমি প্রেমময়, দয়াময়।
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার,
ক্ষুদ্র সরোবর, এর নহে যোগ্য তুলনার।
কুরুক্ষেত্র বীরক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম,
প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্র,—তার এই পরিণাম!
কুরুক্ষেত্রে এইরূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস,
করে নাই নিরমম পরস্পরে উপহাস।

* * * *

পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা;
ছিল না এরূপে তাহা জড়িতা রমণী-লতা।
বসন্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ;
ছিল না কুসুম-বনে লুকাইয়া তীব্র নাগ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার ;
কুরুক্ষেত্রে বীর্য্য-ক্রীড়া ; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া স্মরীর।

*   *   *   *

হরি ! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার ?

সুভদ্রা প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে কহিলেন—

"———————"কর্ম্মফল ! কর্ম্মফল !
এতদিনে ধর্ম্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল।"

কিন্তু কই ? কৃষ্ণ কই ? দম্পতীযুগল আবেগভরে ছুটিলেন। কিয়ৎদূর গিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে এক মনোরম বৃক্ষতলে একটী গৈরিকখণ্ড সুসংস্থাপিত ; সেখানে একটী ভস্মকণাও পড়ে নাই। আর সম্মুখে প্রভাসের বেলাভূমি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন!

"শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুল রাশি,
শোকের শ্মশানে যেন শান্তির শীতল হাসি।"

ভদ্রার্জ্জুনের মনে হইল এইখানে দাঁড়াইয়া দারুক, শৈল ও কেশব প্রভাসের মহাবিপ্লব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা সেই শিলাখণ্ডতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তথাকার পবিত্র রজঃ ললাটে ও বক্ষে ধারণ করিলেন। তার পর উর্দ্ধশ্বাসে আবার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। উর্দ্ধশ্বাসে বহুদূর অতিক্রম করিয়া ভদ্রার্জ্জুন দেখিলেন জননীর অঙ্কে তৃষ্ণাতুর শিশুর ন্যায় একটি রমণী-অঙ্কে মুখ লুকাইয়া এক বীর-দেহ শায়িত। কখনও বা সেই বীরপুরুষ ভূতলে বুক রাখিয়া ছটফট করিতেছে, আবার কখনও বা আত্মহারা উন্মাদের ন্যায় শূন্যে চাহিয়া ছুটিতেছে—দু'নয়ন অশ্রুধারায় ভাসমান। অর্জ্জুন দেখিবামাত্র চিনিলেন, রমণী শৈলজা—আর সেই বীরপুরুষ নাগরাজ বাসুকি। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "শৈলজে" "শৈলজে" বলিয়া

চীৎকার করিয়া তাহাকে আপন বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ছলছল নেত্রে যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায় আছেন কৃষ্ণ ? আছেন কুশলে বল ?"—

অমনই মধুমাখা কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ মাত্র নাগরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

* * * "আহা কি মধুর নাম !
কে শুনাল, জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ ?
গাও নাম আর বার ! গাও নাম শতবার !
সহস্র সহস্র বার ! লও নাম, গাও আর !
গাও নাম পারাবার ! গাও নাম সমীরণ !
গাও নাম চন্দ্র সূর্য্য ! গাও গ্রহ অগণন !
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
নাহি মর্ত্ত্যে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম,
গাও মুখ ! গাও চোক ! গাও অঙ্গ ! গাও প্রাণ !
গাও মুখ মধুস্বরে ! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা ! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া পাষাণ প্রাণ !
নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম !
হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! হরে হরে !
হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! হরে হরে !"

নামোন্মত্ত নাগরাজ পাগল শিশুর মত দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া অবিরাম নাচিতে লাগিল—তাহার বক্ষঃ নয়নধারায় প্লাবিত ; চিত্ত প্রেমানন্দে বিভোর ! কৃষ্ণপ্রেমিকের সেই প্রেম-নৃত্য দেখিয়া ভদ্রা ও ধনঞ্জয় আত্মশোক ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। বাসুকি মহাভাবে

বিভোর হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে ঢলিয়া পড়িতেই ভদ্রা আপন অঙ্কে তাহার শির ধারণ করিলেন। ভদ্রা, শৈল ও পার্থ যেন কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আত্মপ্রেমানন্দে লীন হইয়া রহিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে বাসুকির বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইলে শৈলজা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

* * * "দাদা! পূর্ণ তব মনস্কাম!
যে দেব আরাধ্য তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
চেয়ে দেখ তব শির অঙ্কে সেই সুভদ্রার।
যেই পার্থ শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি
সেবিছেন পদ তব; কি প্রেম, কি অশ্রু খসি
পড়িতেছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার!
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার!
জ্বলিলে একটী জন্ম যেই প্রেমপিপাসায়,
কর পান সেই প্রেম অজস্র সুধা-ধারায়!
পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহ্নবীর
জুড়াইবে প্রাণ তব, জুড়ায়েছে পাপিনীর।"

সুভদ্রার নাম শুনিবা মাত্র নাগরাজ সবিস্ময়ে উঠিয়া ভদ্রার মুখপানে মূর্ত্তিবৎ চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল—

"সুভদ্রা!—জীবনস্বপ্ন! সুভদ্রা!—পিপাসা মম!
একটী চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম!
আমার আরাধ্যা দেবী, আমার সর্ব্বস্ব ধন,—
তার অঙ্কে মম শির, আমি পাপী নরাধম!
হায় মা! একটী জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;

কৌরব-যাদব-রক্তে করিয়াছি কর্দ্দমিত
এই ঘর, এই আত্মা ;—সকলি লীলা তাঁহার !
আজি কোথা সে সুভদ্রা ? সে বাসুকি কোথা আর ?
স্বপন ! স্বপন সব !—বিকট স্বপন ঘোর !
সেই ঘোর অমাবস্যা আজি হইয়াছে ভোর !
আজি সেই পত্নীভাব মনে নাহি পড়ে আর ;
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার !
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে !
সে অঙ্কে শিশুর মত বাসুকি ঘুমাবে সুখে।
তুই মম কারু আজি ; তুই মম শৈল আর ;
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা ! কৃষ্ণ আমার !"

বাসুকি শিশুর মত ভদ্রার অঙ্কে মাথা রাখিতে যাইতেছিল ; কিন্তু যেমনই আবার স্ব-উচ্চারিত কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনই ভাবাবেশে নামগান ও নৃত্য করিতে করিতে সে আত্মহারা ভাবে ছুটিতে ছুটিতে ভদ্রার কোলে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ঈষৎ বাহ্যজ্ঞান হইলে পার্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

* * * "নগেন্দ্র ! আকুল প্রাণ ;
কোথা কৃষ্ণ ? কহ তুমি পেয়েছ কি দেখা তাঁর ?
কোথায় আছেন তিনি ? পাইব কি হায় ! আর
হৃদয়ে সে পদাম্বুজ ? দেখিব নয়ন ভরি'
নরনারায়ণ রূপ, কহ, দাসে দয়া করি !"

কিন্তু নাগরাজ কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ; সুতরাং কেমন করিয়া এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিবে ? যাহার অন্তর-বাহির কৃষ্ণময়, সে কি আর কৃষ্ণের কোনও বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে ? তাই নাগরাজ কহিল—

"কোথা কৃষ্ণ ?—দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয় ?
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় !
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্য্যে, কৃষ্ণ গ্রহ উপগ্রহে,
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
কৃষ্ণ সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক-ধারায়।
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে।
বিলাস-শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বরিষণে।
কৃষ্ণ শার্দ্দূলের দন্তে কৃষ্ণ নারীবিম্বাধরে।
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ শ্রবণে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ অধরে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে।
কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়
কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখনা, হায় !
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ?—কর বক্ষ বিদারিত
দেখিবে আমার সেই ননীচোরা নীলমণি,
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম-ক্ষীর-ননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি !
আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি !

শ্রীদাম, সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে !
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে !
কুঞ্জে কুঞ্জে, জ্যোৎস্নায়, বাজে কি মধুর বাঁশী !
কি প্রেম-যমুনা বহে, কি অনন্ত প্রেমরাশি !
ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—আয় ! আয় !
এই যাই, এই যাই” !——

প্রেমরোমাঞ্চিততনু নাগোন্মত্ত নাগরাজ করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বেগে ছুটিবার উপক্রম করিল দেখিয়া ধনঞ্জয় দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। নাগরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে——

“যাক্ মান, যাক্ কুল ! ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও !
জীবন, যৌবন, নাথ ! লও, তুমি সব লও।”

—বলিয়া ভাবাবেশে পার্থবক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অর্জ্জুনের অংসোপরে বাসুকির মুগ্ধ শির সংরক্ষিত। দুই দিক হইতে দুইটী বিপরীতমুখী নদ আসিয়া যেন প্রেমের এক মহাপারাবারে গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের চির-শত্রু, অথচ উভয়ে দৃঢ় প্রেমপাশে আলিঙ্গনবদ্ধ—উভয়েরই নয়ন প্রেমাশ্রুতে ভাসমান !

শৈলজা এতক্ষণ মুগ্ধ নয়নে ভ্রাতা বাসুকির প্রেমাবেশ নিরীক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু এবার এই মহিমময় দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভাবগদ্গদকণ্ঠে ভদ্রাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

* * * * “চেয়ে দেখ মা আমার !
আর্য্য-অনার্য্যের আজি চিরপ্রেম-সম্মিলন
কি শোকের মরুভূমে,—কে লীলা বুঝিবে তাঁর ?—
উথলিল সুশীতল কি প্রেমের পারাবার !

পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম—,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন!
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা! হৃদয়ে আয়!
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায়!"

শৈলের আর কণ্ঠ সরিল না। সে ছিন্না ব্রততীর মত ভদ্রার বুকে ঢলিয়া পড়িল—আর্য্য-অনার্য্যের চিরবাঞ্ছিত সম্মিলন এতদূরে এইরূপে নিষ্পন্ন হইল। আর্য্য-অনার্য্যের প্রেম ও ভক্তি, আর্য্য-অনার্য্যের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এইরূপে এই ভাবে মিশিয়া ভারতে এক নবযুগের সঞ্চার করিল! ভারতে **মহাভারত** সংস্থাপনের মহিমময়ী কল্পনা সার্থক ও পূর্ণ হইল। ভদ্রাদেবী দেখিলেন—

"আর্য্য-অনার্য্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত,
গঙ্গা-যমুনার মত, কিছু দূর প্রবাহিত
হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে পূর্ণ মিশ্রিত—
করিবে ভারত-ভূমি শান্তি-বারি-বিপ্লাবিত
সহস্র সহস্র বর্ষ। সে শান্তি-প্লাবিত তটে
ফলিবে কতই রত্ন, নীল নৈশাকাশ পটে
অনন্ত নক্ষত্র মত! কত কীর্ত্তি অতুলিত,
অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাহে প্রতিষ্ঠিত;
অসংখ্য মৈনাক মত। মহাকাল-পরিবার
গাইবে সে কীর্ত্তি-গীত, প্রণমিবে অনিবার!"

অপূর্ব্ব ভবিষ্যের চিত্রলেখা দেখিয়া তাঁহার অন্তর মুগ্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শৈল, পার্থ ও নাগরাজের আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পার্থ, নাগরাজকে আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দিতে কাতর অনুরোধ করিলেন। ধীর, স্থির ও শান্তভাবে নাগরাজ কহিলেন—

"দেখেছি, কিরীটি ! আমি দেখেছি নয়ন ভরি
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন হরি !
দগ্ধ মরু দেখে যথা নিদাঘের নবঘন,
দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ।
ঐই শিলাসনে বসি, এই নিম্ববৃক্ষতলা,
অঙ্কে, বক্ষে, কারু মম প্রেমে জড়াইয়া গলা।
বড় পুণ্যবতী কারু ! কি প্রেম-মুরতি খানি !
সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি !
যাদব-শোণিতে সগু কলুষিত কর মম,
তথাপি কি ক্ষমা, দয়া ! কহিলেন—এস ভাই !
এস বক্ষে !—লীলা শেষ,—শান্তিধামে চল যাই।"

*　　*　　*　　*　　*

"কি সুন্দর পুষ্পরথ ! রথ-শিরে সুদর্শন
কিবা চক্র সমুজ্জ্বল ! স্তম্ভ-শিরে সুকেতন,
সুদর্শন চক্রাঙ্কিত, উড়িতেছে কি লীলায় !
কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায় !
রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে
গলা জড়াইয়া প্রেমে, বুকে বুকে, মুখে মুখে
পরশিয়া ভাবাবেশে ; ভাবাবেশে চরাচর
গাইতেছে হরিনাম,—চরাচর, কি সুন্দর !

*　　*　　*　　*　　*　　*

তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম,
প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে, গ্রহে গ্রহে অবিরাম।
সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম-তরঙ্গে আর,
ভাসিয়া উঠিছে রথ ;—বিশ্ব, শান্তি-পারাবার !

আমি রহিলাম পড়ি, হায়! মহাপাপী আমি!
যাদবের সন্থ-রক্তে কলুষিত মম পাণি!
না না নাথ! জানি তুমি, তুমি ত অন্তরযামী,
আমি বনপশু হীন, নহে আততায়ী আমি।
*　*　*　*　*　*
এই দেখ অঙ্গে, অঙ্গে, অস্ত্র-লেখা বাসুকির!
বাসুকি দুর্ব্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য্য বীর।
তুমি বাসুকিরে নাথ! করিয়াছ আলিঙ্গন,
কত দয়া! কত প্রেম! নরহরি! নারায়ণ!"

বাসুকির আবার ভাবাবেশ আরম্ভ হইল; ঘন ঘন দেহ কম্পিত হইতে লাগিল; পুলকিত ও রোমাঞ্চিত দেহে সে নয়নধারায় ভাসিতে ভাসিতে আবিষ্টকণ্ঠে কহিল—

*　*　*　"দেখ কি সুন্দর!
কি সুন্দর বৃন্দাবন! কি কদম্ব মনোহর!
কি জ্যোৎস্না! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি!
কি পুষ্প-সৌরভ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী!
কি প্রেমমূরতি শিশু, কি প্রেম, নয়নধারা!
গলা জড়াইয়া কারু, প্রেমময়ী, আত্মহারা!
ওই বাজিতেছে বাঁশী, কি মধুরে—"আয়! আয়!"
এই যাই, এই যাই।"

মহাভাববিভোর বাসুকি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভাবাবেশে প্রেমভরে ধরা-বক্ষে ঢলিয়া পড়িতে না পড়িতে পার্থ ক্ষিপ্রকরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া সুভদ্রার অঙ্কে তাহার শ্লথ, মুগ্ধ শির স্থাপিত করিলেন। তারপর তাহার পদতীর্থ বক্ষে ধারণ করিয়া শৈল ও

পার্থ উদাস নয়নে বাসুকির প্রদর্শিত সেই প্রেম-বৃন্দাবনের প্রতি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া প্রেমানন্দে উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহারা উভয়ে যমুনার সেই কলধ্বনি—নবনটবর শ্রীকৃষ্ণের সেই মোহন মুরলীধ্বনি—শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে থাকিয়া মহাভাববিভোর বাসুকির অন্তরাত্মা সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবনের পানে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল! বসুন্ধরা যেন নিমেষের নিমিত্ত মহাভাবে কাঁপিয়া উঠিল—প্রভাসের ঘোরাল সিন্ধু যেন মহাভাবে বারেক উচ্ছ্বসিত হইল—আর বিশ্বচরাচর ধীরে ধীরে কি গাঢ় তমিস্রায় আচ্ছন্ন হইয়া যেন মহাভাবে সমাধিস্থ হইয়া পড়িল!

আমরা কথাপ্রসঙ্গে নাগরাজ বাসুকির এই মহাপ্রয়াণের উল্লেখ বিস্তৃতভাবে করিয়াছি। শৈলজার সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে নাগরাজের চরিত্রের যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল,—পার্থবিদ্বেষী, সুভদ্রাকরপ্রার্থী বাসুকি জীবনের শেষ অঙ্কে যে কি মহান ত্যাগ ও প্রেমের অধিকারী হইয়াছিল—তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইলে আমরা শৈলজার দেব-চরিত্রের মাধূর্য্য ও মহত্ত্ব সেই সঙ্গে বুঝিয়া উঠিতে পারি। আর বুঝিতে পারি, যে সঙ্গ ও সাহচর্য্য গুণে অনার্য্য নারী বা নর কেহই আর্য্যের ন্যায় আত্মোন্নতি সাধনে অক্ষম বা অকৃতকার্য্য হয় না—বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনার্য্য, আর্য্যের তুলনায় মানবোচিত গুণরাজির অনুশীলনে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি ও ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

প্রভাসের মৌনমুগ্ধা, উদাসিনী সন্ধ্যা এই ভাবে সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক অভিনয় করিয়া ধীরে ধীরে সিন্ধুবক্ষে ঘনাইয়া আসিতেছিল। সম্মুখে ধূসর-বসনা, গৈরিকাবৃতা বেলাভূমি যেন যোগস্থার ন্যায় ... কণ্ঠে সেই অনির্ব্বাণ মহানির্ব্বাণের গীত স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল!

বেলাতটে, যেই নিম্ববৃক্ষমূলে, শিলাসনে বসিয়া নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র শিলাসনে শির স্থাপন করিয়া ভদ্রাদেবী অন্যতর ক্ষুদ্র এক শিলাখণ্ডে সমাসীনা। ক্রোড়ে আহতা, করুণাময়ী, যোগিনী শৈলজার মস্তক স্থাপিত। যেন অম্বুজ-স্তবকের মধ্যে একখানি অপরাজিতার মাল্য সংন্যস্ত। যোগস্থা শৈলজার শিরোদেশে দ্বৈপায়ন ও পদতলে ধনঞ্জয় স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া এই শান্তিময়ী উদাসিনীর করুণাপূর্ণ, শান্তময় মুখখানি অনিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

শৈলজা আজ কয়েক দিবস হইল ভদ্রা সমভিব্যাহারে প্রভাসের শশ্মানক্ষেত্রে উৎপীড়িত, আহত ও লাঞ্ছিত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। যদুবংশ ধ্বংশের পর, অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রভাসে পঙ্কিল পাপের প্রবাহে কামাসক্ত, সুরামত্ত নরনারী আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল; চারিধার লুণ্ঠন, হরণ ও উৎকট পাশব অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল! অনাথা রমণীর ক্রন্দন, অনাথ শিশু ও বৃদ্ধের মর্ম্মভেদী চীৎকার, প্রবীনের হাহাকার, শিশুর রোদন, নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তগণের উপেক্ষার তীব্র অট্টহাস মিলিয়া যেন পবিত্র প্রভাসকে পিশাচের তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ফেলিল! গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-বল শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত। অর্জ্জুনের ধমণীতে আর সে কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর্য্য নাই। তিনি স্থবিরের যষ্টির ন্যায় গাণ্ডীবে ভর করিয়া নিদারুণ মনস্তাপে প্রভাসের এই নরক সন্দর্শন করিতেছিলেন। সহসা এক পাপিষ্ঠা যাদবী সুভদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া ঈর্য্যাভরে তাহার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করিল। করুণারূপিণী শৈলজা তাহা লক্ষ্য করিবা মাত্র সবেগে ছুটিয়া গিয়া আপন বক্ষঃ পাতিয়া সেই বর্শা ধারণ করিল। ভদ্রাদেবীর প্রাণ রক্ষা হইল। তিনি আহতা, করুণাময়ী শৈলের রুধিরাপ্লুত, অবসন্ন দেহখানি

সিন্ধুবেলাতটে পূর্ব্বোক্ত শিলাসনে বহন করিয়া আনিয়া তাহার সেবায় তৎপর হইলেন।

আজ মহর্ষি দ্বৈপায়ন শৈলজাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সহসা কি যেন সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া শৈল নয়ন উন্মীলন করিল। তাহার ক্ষীণ অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল—যেন সুনীল দর্পণে জ্যোৎস্না ভাসিয়া উঠিয়াছে! সে চাহিয়া দেখিল, শিরোদেশে ভগবান দ্বৈপায়ন দণ্ডায়মান। শৈল সজল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিল—

——— ———"দেও পাদপদ্ম পিতঃ!"

তারপর পার্থের প্রতি চাহিয়া কহিল--

"দেশ দেশান্তরে তুমি যেই অনাথায়
খুঁজিলে অধীর শোকে, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
চাহিলে দুহিতা মত বসাইতে, হায়!
দেখ সে দুহিতা তব, মাতা সুভদ্রার অঙ্কে,
কি ছার খাণ্ডব-রাজ্য তুলনায় তার?
তোমার কৃপায় আজি, পতি মম নারায়ণ!
যেই প্রেমগঙ্গা, পদে জন্মিল তোমার,
পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার!
পেয়েছ দুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
লহ দুহিতায় বুকে, গাও কৃষ্ণনাম।"

পার্থ শোকে অভিভূত হইয়া শৈলজার ক্ষুদ্র বক্ষে 'মা! মা!' বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। শৈল সুভদ্রা-অঙ্কে শির সংন্যস্ত করিয়া প্রেমভরে দুই হাতে পার্থের গলা জড়াইয়া ধরিল।



প্রীতির প্রতিমা সুভদ্রা সমুদ্র-বেলায় নিম্ববৃক্ষমূলে স্বীয় অঙ্কোপরি শায়িতা আহতা শৈলজার মুখপানে চাহিয়া উপবিষ্টা ।

পার্থ বাষ্পবিগলিতকণ্ঠে কহিলেন—

——————"মা ! তোর এ ক্ষুদ্র বুক
অর্জ্জুনের শান্তিধাম, ত্রিদিব তাহার ;
অর্জ্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণাময়ি!
লইবি কি কাড়ি,—করি মরু এ সংসার ?
তিরোহিত নারায়ণ ; ধ্বংসশেষ যদুকুল,
স্বপ্নশেষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার ;—
বড়ই আকুল প্রাণ—মরুভূমি এ সংসার !
একই সান্ত্বনা তুই পার্থ-সুভদ্রার।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, ভুলিনু পুত্রের শোক,
ভুলিনু সংসার মা গো ! দেখি তোর মুখ।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, আশ্রম-কুটীরখানি
হয়েছিল কি স্বর্গ মা ! কি স্বর্গ এ বুক !
আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শান্তি,
হরিয়া কি যাবি তুই দিয়া নব শোক ?
পাইয়াছি পুত্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক,
জীবন-সন্ধ্যার শেষে হরিয়া আলোক ?

* * * *

যাবি যদি, নিয়ে চল তোর করুণার বক্ষে
যথা পুত্র, যথা কন্যা যাইবি আমার !"—

পার্থের কণ্ঠে আর কথা সরিল না। তিনি দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শৈল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—

"এ শোক পিতঃ ! কর পরিহার !
শৈলের কি শুভ দিন ! এমন কে আছে বল,

এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার !
শুয়েছে কি মহাতীর্থে, এ পবিত্র দেব-বুকে,
আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ
তার পুত্র, পুত্রবধু,—উত্তরা ও অভিমন্যু,
আসিয়াছে পিতা, মাতা,—কি পুণ্য জগত !"

তার পর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আকাশের পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল—

"কেবল একটী ভিক্ষা চরণে তোমার।
ওই দেখ নিম্ববৃক্ষ, পবিত্র ছায়ায় যার
হইলেন তিরোহিত নরনারায়ণ,
এই কাষ্ঠে দারুমূর্ত্তি, অনার্য্য শিল্পীর করে
নীলমাধবের পিতঃ ! করিবে সৃজন।
এক পার্শ্বে **জগন্নাথ**, অন্য পার্শ্বে **ধনঞ্জয়**,
শান্তির প্রতিমা মধ্যে **সুভদ্রা** জননী,
অনন্ত করুণাময়ী—পতিতপাবনী।
প্রভাস-সিন্ধুর তীরে, এই তিরোধান-ক্ষেত্রে,
মন্দির গগনস্পর্শী করি বিনির্ম্মিত,
এই তিরোধান-শৈলে নির্ম্মাইয়া রত্নবেদি,
নবধর্ম্ম-মহামূর্ত্তি করিবে স্থাপিত।"

*　　*　　*　　*

আর, "এ মন্দির, এ মুরতি নীলমাধবের, পিতঃ !
অনার্য্যের করে তুমি করিবে অর্পণ ;
যুগে যুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হুতাশনে,
রক্ষিবে পতিত মূর্ত্তি—পতিতপাবন।"

পতিতোদ্ধারব্রতনিরতা তাহার এ ভিক্ষা কেন তাহাও বিশেষ
রিয়া বলিল—

"আছে জ্ঞান আর্য্যদের, আছে শাস্ত্র আর্য্যদের,
অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ;
পতিত অনার্য্যদের, কিছু নাই, কেহ নাই,
দিও তাহাদের মূর্ত্তি—পতিতপাবন!
এই মন্দিরের ক্ষেত্র, আর্য্যের ও অনার্য্যের
হইবে শ্রীক্ষেত্র,—মহা-সম্মিলন-ধাম
অনার্য্য, ব্রাহ্মণ-আর্য্য, গাবে এক কৃষ্ণ নাম,—
আর্য্য ও অনার্য্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।"

অর্জ্জুন উচ্ছ্বাসভরে কহিলেন—

"মা! আমার!

অর্জ্জুন, অর্জ্জুন-পৌত্র, প্রপৌত্র তাহার,
করি শূন্য কোষাগার, ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনার,
পালিবে মা! তোর আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা আমার।
অর্জ্জুন আকণ্ঠ বীর-রক্তে নিমজ্জিত;
এ মহাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাপীরে,
এ পবিত্র বেদি মাগো! হবে কলুষিত।

* * * *

মধ্য মূর্ত্তি জগন্নাথ, শৈলজা সুভদ্রা পার্শ্বে,
বিরাজিবে কাল-বক্ষে এ তিন মুরতি;
মধ্যে হরি হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-সরস্বতী,
বহিবে অলকানন্দা, মাতা ভাগীরথী।"

উত্তর শ্রবণ করিয়া শৈলজার মুখ মলিন হইয়া গেল। অন্তরে এক দারুণ সংশয় অনুভব করিয়া সে সজল নয়নে কহিল—

"ধনঞ্জয় মহাপাপী !
কৃষ্ণসখা পাপী ! তবে পাপী, নারায়ণ !
তাঁর রাজ্যে কত হত্যা ! কি জীব-শোণিত-সিন্ধু
হইতেছে তাঁর রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত !
সেই নরহত্যা-ক্ষেত্র, তুলনায় কুরুক্ষেত্র,
অনন্ত সিন্ধুর কাছে বিন্দু পরিমিত।

*   *   *   *

অধার্ম্মিক, মহাপাপী, আজন্ম শত্রুর প্রতি,
রণক্ষেত্রে করুণায় শ্লথ কর যা'র—
আমি পতিতার প্রতি করুণার এ প্রবাহ,
পাপী সেই **বলদেব**, দেবতা আমার !"

তার পর ধীরে ধীরে ভগবান্ ব্যাসদেবের পানে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—

"কহ ভগবান !
দুহিতার এ কামনা, শিষ্যার অন্তিম আশা,
করিবে পূরণ তুমি, তুমি পূর্ণকাম !"

ভগবান ব্যাসদেব শান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"তথাস্তু।"

শৈল প্রসন্ন মুখে কহিল—

"আর এক ভিক্ষা প্রভু !
একটী আশঙ্কা-ছায়া তব দুহিতার
পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার।

*   *   *   *

চলিলাম নাগপুরে, অনার্য্যের অভ্যুত্থান
নিবারিতে,—কিন্তু লীলা কে বুঝিবে তাঁর ?
শুনিলাম সেনাপতি তক্ষক গিয়াছে চলি
লুণ্ঠিতে যাদব-পত্নী যাদব-ভাণ্ডার,—.
কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর !
এ পাপের পরিণাম জ্বলিবে কি কুরুক্ষেত্রে,
আর্য্যের ও অনার্য্যের, ভারতে আবার ?
আবার অনার্য্য জাতি হবে হিংস্র পশু মত,
উৎপীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংসিত আর ?
আবার কি নররক্তে যাবে ভাসি ধর্ম্মরাজ্য—
এই প্রেম, এই শান্তি, এই সম্মিলন
আর্য্যের ও অনার্য্যের হইবে স্বপন ?

শৈলের ইহাই যে চরম ও পরম প্রশ্ন ! আজীবন ধরিয়া তিলে তিলে আত্মদান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বৈপায়নের করুণা-বলে সে যে আর্য্য ও অনার্য্যের পবিত্র মহাসম্মিলন ঘটাইয়াছে। তাহার চিরবাঞ্ছিত সেই পবিত্র সম্মিলন--নিরাশাপীড়িত জীবনের সুখ-স্বপ্ন—চিরজাগ্রত কামনার শান্তিসৌধ, কি অদূর ভবিষ্যতে আবার ভাঙ্গিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে ? তাহা হইলে যে তাহার আকৈশোর আচরিত সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেল ! মরণেও যে তাহা হইলে সে শান্তি লাভ করিতে পারিবে না !

মহর্ষি দ্বৈপায়ন শৈলের এই কঠোর সংশয়ের বিষয় পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তিনি স্থিরনেত্রে শৈলজার পানে চাহিলেন ; দেখিতে দেখিতে শৈলের লক্ষ্যহীন নয়ন নিমেষে স্থির, অবিচল ও

শান্ত হইয়া পড়িল। যোগস্থা প্রতিমার ন্যায় শৈল মহর্ষির পানে চাহিয়া রহিল। মহর্ষি কহিলেন—

"ভারতের জগতের
দেখ মহা ভবিষ্যৎ!—কি দেখিছ বল?"

শৈল একে একে চক্ষুর সম্মুখে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত দেখিল, তাহাই বলিতে লাগিল। শৈলদৃষ্ট সেই দৃশ্যাবলী ভারতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর বিচিত্র চিত্রনিচয়। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম।

শৈল দেখিল নিদারুণ সমরানল জ্বলিয়াছে। তক্ষকের মহাপাপে যজ্ঞানলে পতঙ্গদলের ন্যায় সমস্ত নাগজাতি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কারুর পালিত পুত্র আস্তিক মহর্ষির শ্রীপদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তার পর অপহৃতা যাদবীর পুত্রগণ ঋষিবরের সহিত এক সন্ধিপাশে আবদ্ধ হইতে সেই অশান্তির অবসান হইল। কৃষ্ণপ্রেমে আবার আর্য্য ও অনার্য্যের পূর্ণ সম্মিলন হইল। এই সম্মিলিত আর্য্য ও অনার্য্য জাতি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে শান্তি ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিচিত্র ক্রমোন্নতির পথে প্রধাবিত হইল। আবার অধর্ম্মের কালমেঘ সঞ্চারিত হইয়া ভারতের সেই শান্তি-জ্যোৎস্না-প্লাবিত নির্ম্মল গগন ছাইয়া ফেলিল। কর্ম্ম যাগযজ্ঞে পরিণত হইল। —ধর্ম্ম মাত্র নির্ম্মম স্বার্থে রূপান্তরিত হইল। আবার অন্তর-বিগ্রহানলে ভারত বিদগ্ধ হইল। তাহার গগন যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল!—তাহার ভূতল জীবরক্তে রঞ্জিত হইতে লাগিল! ভারতের সে শক্তি ও সমৃদ্ধি—সে শান্তি ও ধর্ম্মরাজ্য যেন স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইল! শৈল দেখিল—ভারতের সেই দুঃসময়ে, হিমাদ্রির ছায়াতলে,

মানব-হিমাদ্রির ন্যায় ভগবান **বুদ্ধদেব** মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে অবতীর্ণ হইয়া ভৈরবকণ্ঠে এক মহান্ কর্ম্মবাদ ও নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। তাঁহার মহাকরুণার স্রোতে ভারতের সেই বিগ্রহানল ও যজ্ঞধূম নির্ব্বাপিত হইল। নির্ম্মম জীবরক্তপ্রবাহ থামিয়া গেল। ভারত প্লাবিয়া সেই অহেতুকী করুণার স্রোত বহিয়া গেল। কত দেশ দেশান্তরে, কত পতিত জাতির উদ্ধার হইল—কত মহারাজ্য, উপরাজ্য সৃষ্ট হইল—দেশে দেশে কি শান্তি ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা হইল —ধরা যেন কি অপূর্ব্ব স্বর্গে পরিণত হইল! নিমেষের মধ্যে যেন আবার পটপরিবর্ত্তন হইয়া গেল—এই যুগল ধর্ম্মস্রোত একে একে বিলুপ্ত হইয়া আবার অধর্ম্মের বিভীষিকা উৎপাদন করিল! শৈল দেখিল, পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ অন্ধকারে নিমজ্জিত—ধরার অর্দ্ধাংশ মানব পতিত রহিয়াছে। এই অর্দ্ধাংশ পতিত মানবের উদ্ধারের জন্য করুণাময় ভগবান **যীশু খ্রীষ্টের** আসন টলিল; তিনি শান্তির অবতাররূপে সুদূর লবণ সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে নব যদুকুলে নব যদুস্থানে অবতীর্ণ হইয়া কঠোর আত্মবলিদানে পতিতোদ্ধারে ব্রতী হইলেন। নরপশুগণ এ হেন অলৌকিক মহান দেবত্বের আদর্শ চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না—পাষাণময় নর-মরুভূমি তাঁহার অপার্থিব করুণার স্রোতে দ্রবীভূত হইল না। প্রেমময়, ভগবান **মহম্মদ** তখন মহামানব-মরুভূমিতে ভোগবতীর সঞ্চার করিতে লোহিত-সমুদ্রতীরে আর একবার অবতীর্ণ হইলেন। এবার সুখ্যরসমূর্ত্তি ও নবধনঞ্জয়রূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন। পৃথিবীব্যাপী আবার নব কুরুক্ষেত্র জ্বলিয়া উঠিল—অধর্ম্মের ও দুষ্কৃতির উচ্ছেদ সাধন আরম্ভ হইল। অন্তরবিগ্রহানলে ধর্ম্মহীন ভারত বলহীন হইয়া উৎপীড়িত ও জর্জ্জরিত হইতেছিল, এমন সময় সেই দাবানল ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। শৈল দেখিল, সেই মৃতকল্প ভারতকে হরিনামমন্ত্রে

সঞ্জীবিত করিবার জন্য প্রেমকল্পতরু আরবার **শ্রীগৌরাঙ্গ** রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

তখন জাহ্নবী তীরে, চারু নব-বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার ;
কি মধুর প্রেম-রসে ভাসিছে ভারতভূমি !
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার !
কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীতধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী, দণ্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধুলা, প্রেমে গোরা আত্মহারা,
নয়নে যুগল-ধারা প্রেম-জাহ্নবীর !
'হরিবোল ! হরিবোল'—নাচে গোরা বাহু তুলি
ধুলায় সোনার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি !
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারী, প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরিবোল ! হরিবোল'—!' গাইতেছে নরনারী,
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গায় ভাগীরথী ;
'হরিবোল ! হরিবোল'—!' গাইতেছে পশুপক্ষী,
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গায় জলপতি !"

বিরাট বিশ্ব ভরিয়া এক হরিনামের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইল। ভক্তি, প্রেম ও আনন্দে শৈলের ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে শৈল উচ্ছ্বাসভরে গাহিল—**হরিবোল ! হরিবোল !** মহর্ষি দ্বৈপায়নের কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি হইল—**হরিবোল ! হরিবোল !** পার্থ ও সুভদ্রা সেই প্রতিধ্বনি বিলীন হইতে না হইতে গাহিলেন—**হরিবোল ! হরিবোল !**

সুপবিত্র হরিনাম শুনিতে শুনিতে দেবী সুভদ্রার অঙ্কে শৈল ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিল ! বসন্তের শেষ সন্ধ্যা সিন্ধু গর্ভে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল ! শোকার্ত্ত ধনঞ্জয় 'মা মা' রবে সিন্ধুতীর প্রকম্পিত করিয়া শৈলের বুকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভদ্রা দেবী আর সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীনার ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেছিলেন এমন সময় ভগবান দ্বৈপায়ন দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—

"সুভদ্রে ! সম্বর শোক !
তব করে ধর্ম্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত।"

সুভদ্রা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া শৈলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন প্রীতির প্রতিমা শৈলজা যেন কি আনন্দ-স্বপ্নে মগ্ন হইয়া শান্তি-সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আর শিরোদেশে ভগবান দ্বৈপায়ন ধ্যানে নিমজ্জিত।

"ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়া মহর্ষি স্থির,
মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন বক্ষে পড়ি শৈলজার ;
প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শান্ত শৈল মুখ
চাহিয়া চাহিয়া ভদ্রা দেখিল না আর।"



শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।